গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ২২ - ২৮ এপ্রিল ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন নিয়ে কেন এই জটিলতা

দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন নিয়ে অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেস, সি পি এম এবং জি এন এল এফ-এর সংকীর্ণ স্বার্থকেন্দ্রিক রাজনীতিই পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে।

গত ২৩ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় একটি বিল এনে যখন পার্বত্য পরিষদের নির্বাচনকে আবারও ছয় মাস পিছিয়ে দেওয়া হয় সেইসময় এস ইউ সি আই পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার তার তীব্র বিরোধিতা করে ওয়াকআউট করেন। তিনি দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার দাবি জানান। কিন্তু কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস সহ অন্যান্য দলের বিধায়কদের কোন বিরোধিতা ছাড়াই বিলটি পাশ হয়ে যায়। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শক্রমে জি এন এল এফ নেতা সুবাস ঘিসিংকেই একক প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করে। ফলে পাহাড়ের মানুষের নির্বাচনের অধিকার তৃতীয়বারের মত শুধু উপেক্ষিত হয় তাই নয়, পূর্বেকার নির্বাচিত বোর্ডের পরিবর্তে একক প্রশাসক নিয়োগের মধ্য দিয়ে পার্বত্য পরিষদের গণতান্ত্রিক পরিচালনার ছিটেফোঁটা যতটুকু সম্ভাবনা ছিল, তাকেও নস্যাৎ করা হয় এবং একক স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে যাওয়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়।

সুবাস ঘিসিং-এর দাবি অনুযায়ী এইভাবে বারবার পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই কতগুলি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রথমত, জি এন এল এফ নেতা সুবাস ঘিসিং এখনই নির্বাচনের পথে যেতে চাইছেন না কেন? দ্বিতীয়ত, কেন রাজ্য সরকার নির্বাচনী বিধি মেনে যথাসময়ে নির্বাচন করার ক্ষেত্রে দৃঢ় পদক্ষেপ নিচ্ছে না? তৃতীয়ত, এই নির্বাচন নিয়ে কেনই বা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার সুবাস ঘিসিং-এর প্রতি নরম মনোভাব নিয়ে চলছে?

বঞ্চনার দীর্ঘ ইতিহাস

একথা সকলেরই জানা যে, দার্জিলিং পার্বত্য এলাকায় সুদীর্ঘ কংগ্রেস শাসনে বঞ্চনা, অবহেলা ঐ এলাকার মানুষের মধ্যে সঙ্গতকারণেই ক্ষোভের

চারের পাতায় দেখুন

ত্রুটিবিচ্যুতি ও দুর্বলতা নির্মূল করে পার্টিকে আরও বলীয়ান করুন

এস ইউ সি আই-এর ৫৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে

সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর আহ্বান

আমাদের নেতা, শিক্ষক, পথপ্রদর্শক এবং এযুগের একজন অগ্রগণ্য মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আমাদের প্রিয় দল সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া তার জন্মলগ্ন থেকে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করে এসেছে, তা স্মরণ করার জন্য এবং এই গৌরবময় ঐতিহ্যকে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে বলিষ্ঠতার সাথে বহন করে এগিয়ে চলার জন্য দলের ৫৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমি দলের সকল নেতা ও কর্মীকে আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রথমত, ভারতের একমাত্র সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে আমাদের পার্টি কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবনকালের সমগ্র পর্যায়ে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের প্রতিটি সন্ধিক্ষণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে এবং সর্বহারা আন্তর্জাতিকতার পতাকা সর্বদা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবনাবসানের পর তাঁরই চিন্তায় সমৃদ্ধ এই পার্টি সেই ঐতিহ্যকে বহন করেছে এবং বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলন যখন যেসব জটিল প্রশ্ন ও সংশয়ের সম্মুখীন হয়েছে, তার সঠিক সমাধান দেখিয়েছে, এই সময়কার আন্তর্জাতিক সমস্ত জটিল

ছয়ের পাতায় দেখুন

কমরেড শিবদাস ঘোষের উদ্ধৃতি প্রদর্শনী

২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই-এর ৫৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে দলের কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে গত ১৫ এপ্রিল দক্ষিণ কলকাতার যতীন দাস পার্কে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা সম্বলিত একটি উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সুসজ্জিত এই প্রদর্শনী এলাকার সর্বস্তরের জনসাধারণ এবং পথচলতি সাধারণ মানুষ গভীর আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেন

ভিতরের পাতায়

- মিড-ডে মিল ও স্কুল-ছুট সমস্যা
- হাইতি
- মুনাফা লুটে নিয়ে যাচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো
- জেলায় জেলায় আন্দোলন

পোপকে সাম্রাজ্যবাদীরা কীভাবে ব্যবহার করেছে

পোপ দ্বিতীয় জন পল-এর মৃত্যুতে পশ্চিমের সকল পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসকশ্রেণীর পক্ষ থেকে ভক্তিপ্রদর্শনের বাঁধ ভাঙা বন্যা বইয়ে দেওয়া হল। শোকপ্রকাশের জাঁকজমকেও খামতি রাখা হয়নি। ক্যাথলিক চার্চের একজন নেতার মৃত্যুতে ভক্তির এমন প্লাবন ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি, অন্তত কারও স্মরণে নেই। ভারতের পুঁজিবাদী শাসকরাও তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছিল।

এই ভক্তিযজ্ঞের প্রধান পুরোহিতের ভূমিকা নিয়েছিল আমেরিকা। অথচ বলা হয়, চার্চ থেকে রাষ্ট্রকে পৃথক করার নীতির উপরই নাকি এই দেশটি প্রতিষ্ঠিত। তদুপরি এই দেশের জনসংখ্যার মাত্র ২৪ শতাংশ নিজেদের পরিচয় জানাতে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের উল্লেখ করে। ভক্ত শিরোমণিদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছে ব্রিটেন। অথচ, ব্রিটেনের চার্চ, আজ থেকে ৫০০ বছর আগে ষষ্ঠদশ শতাব্দীতেই রোমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল।

স্বাস্থ্যের অবনতি থেকে মৃত্যুর পর সমাধি পর্যন্ত পোপই ছিলেন বিশ্বের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর প্রচারমাধ্যমের মুখ্য সংবাদ। এসময় আন্তর্জাতিক ও দেশিয় ক্ষেত্রে কত গুরুতর ঘটনাই ঘটেছে, কিন্তু সংবাদমাধ্যমে তা স্থান পায়নি। বিরাট আকারে দেওয়া হয়েছে মিনিটে মিনিটে পোপের স্বাস্থ্যের অবস্থার পরিবর্তনের খুঁটিনাটি বিবরণ, ভাটিকানে সমবেত হাজার হাজার মানুষের কাতর অপেক্ষার সংবাদ। আর শোনানো হয়েছে বিশ্বের ঘটনাবলীর উপর জীবিতকালে পোপের বিশাল প্রভাবের কাহিনী। ইন্দোনেশিয়ায় মাত্র তিন মাসের মধ্যেই দ্বিতীয়বারের ভূমিকম্পে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু, সাম্রাজ্যবাদী দখলাধীন ইরাক ও আফগানিস্থানে প্রতিদিনের ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের সংবাদ মিডিয়ায় স্থান পায়নি, পেলেও পোপ সংক্রান্ত

পাঁচের পাতায় দেখুন

২৪ এপ্রিল শহীদ মিনারের জনসভায় যোগ দিন

মুর্শিদাবাদ

রাণীতলায় মহিলাদের বিক্ষোভ

ষষ্ঠ শ্রেণীর এক স্কুল ছাত্রীর খুনীকে ধরতে ব্যর্থ হলেও রাণীতলা থানার ও সি স্বপন ভৌমিক, ওই এলাকায় নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিতে আন্দোলনকারীদের নেতাকে ডেকে অশোভন আচরণ করে বীরত্ব দেখানোর লোভ সংবরণ করতে পারেনি। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি, সমবেত নারী-পুরুষ ওসির আচরণের প্রতিবাদ করে। ওসি সংযত হন ও দুঃখ প্রকাশ করেন। সমাজ বিরোধীদের সঙ্গে আঁতাত, ঘুষ নেওয়া প্রভৃতিতে অভ্যস্ত এক শ্রেণীর নীতিহীন পুলিশ পুঙ্গবদের হাতে কত নারী প্রতিদিন নিগৃহীতা হচ্ছেন তবুও নিয়ম অনুযায়ী এদের কাছেই নারী নির্যাতনের প্রতিকার চাইতে যেতে হয়। এমনই পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে একটি বিক্ষোভ সভা হয়ে গেল রাণীতলা থানার ফুলপুরে। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ওই গ্রামেরই খড়িবোনা কে সি কে হাই মাদ্রাসার ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী ববিতা খাতুন পড়তে গিয়ে নিখোঁজ হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে রফিক নামে এক যুবকের সঙ্গে তাকে শেষবার দেখা যায়। রফিক, ববিতার বাবার পূর্ব পরিচিত এবং ওদের বাড়িতে যেত। ইসলামপুর পমাইপুর গ্রামের এই রফিক রাণীতলা থানার কামারীতে শ্বশুরবাড়ি থাকতো। সন্দেহের তীর তার দিকে থাকায়, পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়, কিন্তু গত মাসাধিক কালের মধ্যে এই অভিযুক্তকে ধরতেই পারলো না পুলিশ। তাছাড়া ওই ঘটনার এক মাসের মধ্যেও দুজন গৃহবধূ সহ ৩ মহিলা খুন হয়, কিন্তু পুলিশ নিষ্ক্রিয়। স্থানীয় অসহায় ক্ষুব্ধ মানুষ বাধ্য হয়ে প্রতিবাদ ও আন্দোলনের রাস্তা বেছে নেয়। ২৯ মার্চ মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে এলাকায় খুন, সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন ও মদের ব্যবসা বন্ধের দাবি সহ ববিতা খাতুনের হত্যাকারীকে গ্রেপ্তারের দাবিতে সহস্রাধিক নারীপুরুষের উপস্থিতিতে এক কনভেনশন হয়। গঠিত হয় নারী নির্যাতন বিরোধী নাগরিক কমিটি। কমিটি পরদিনই বিক্ষোভ অবস্থানের ডাক দেয়। ৩০ মার্চ এক মিছিল ও বিক্ষোভে সামিল হয় সহস্রাধিক নারীপুরুষ। পরে গীতা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে, ইস্রাফিল সেখ, খোস মহম্মদ, সীমা খাতুন ও সরস্বতী মজুমদার এই পাঁচ জনের একটি প্রতিনিধি দল ওসির হাতে স্মারকলিপি তুলে দিয়ে ববিতার হত্যাকারীকে ৭ দিনের মধ্যে গ্রেপ্তারের দাবি জানান। ওসি অন্যান্য দাবিগুলির প্রতি সহমত পোষণ করেন, অপরাধীকে গ্রেফতারের প্রতিশ্রুতি দেন।

সুতি বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

১২ এপ্রিল এস ইউ সি আই সুতি লোকাল কমিটি এবং কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের উদ্যোগে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। ডেপুটেশনে বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিল ও মাশুলবৃদ্ধি প্রত্যাহার করা, ভ্যাট প্রত্যাহার করা, সরকারি ব্যবস্থাপনায় সস্তায় পাট বীজ ও কীটনাশক সরবরাহ, অসেচ অলাকায় সেচের ব্যবস্থা করা, কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা, ফসলের ন্যায্য দামের ব্যবস্থা করা, বিড়ি শ্রমিকদের সরকার নির্ধারিত মজুরি প্রদান, লগবুক ও পিএফ দেওয়া, গরিবদের বিপিএল কার্ড দেওয়া এবং সবাইকে রেশন কার্ড দেওয়ার দাবি জানানো হয়।

ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন সুতি লোকাল কমিটির ইনচার্জ কমরেড সুবোধ কুমার দাস এবং শিশির সিংহ, সমীরুদ্দিন, ঝর্ণা রায় প্রমুখ। বিক্ষোভ জমায়েতে বক্তব্য রাখেন কমরেড বিমল কৃষ্ণ দাস।

স্বনিযুক্তি প্রকল্পের ভাঁওতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

প্রতিবন্ধী যুবক নইমুদ্দিন মহলদারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে কয়েকমাস জেলে রেখেছিল। তাঁর অপরাধ — তিনি স্বনিযুক্তি প্রকল্পের জন্য ঋণ নিয়ে সময়মতো শোধ করতে পারেন নি। একই অবস্থা হয়েছে সুতি থানার ইব্রাহিম সেখ, ইলিয়াস সেখ, সুকুমার সিংহদের। এমন ঘটনা জেলার সর্বত্র ঘটছে। এই ঋণগ্রহীতাদের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ড বাতিল করা হয়েছে। ফলে তারা কোথাও চাকরির আবেদনও করতে পারবেন না। এই হয়রানি এবং নির্যাতনের প্রতিবাদে ঋণগ্রহীতারা ৩০ মার্চ জঙ্গীপুর মহকুমা শাসক অফিসে প্রবল বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং এস ডি ও'র হাতে স্মারকলিপি পেশ করেন। এস ডি ও সমস্যায় জড়িত ঋণগ্রহীতাদের নামের তালিকা চান এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যাগুলি প্রতিকারের আশ্বাস দেন। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সারা ভারত স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা সহ-সম্পাদক সামসুল আলম।

বর্ধমান

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এ আই কে কে এম এস-এর আউসগ্রাম থানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ৮ এপ্রিল বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানার পুবার গ্রাম হাইমাদ্রাসায় সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের আউসগ্রাম থানা সম্মেলনে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ১০৫ জন প্রতিনিধি যোগ দেন।

আউসগ্রাম থানায় অন্নপূর্ণা এবং অন্ত্যোদয় যোজনার চাল গম প্রকৃত গরিব মানুষদের না দিয়ে ডিলাররা যে মেরে দিয়েছে তার বিরুদ্ধে কে কে এম এস-এর নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের আন্দোলনকে সিপিএম কীভাবে বিরুদ্ধতা করছে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ডিলারদের পক্ষ নিয়েছে তার উপর বিভিন্ন প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন।

প্রতিনিধিরা খেতমজুরদের সারা বছর কাজ, ন্যায্য মজুরি ও পরিচয় পত্র দেওয়ার দাবিতে, পঞ্চায়েতের নয়া বর্ধিত খাজনা প্রত্যাহার, সমস্ত গরিব মানুষকে বিপিএল কার্ড, ফসলের ন্যায্য দাম, সেচের ব্যবস্থা এবং পঞ্চায়েতের দুর্নীতি বন্ধ করা প্রভৃতি দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

কমরেড ডাঃ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে এই সম্মেলন পরিচালিত হয়। সম্মেলন থেকে কমরেড মোস্তাফাকে সভাপতি ও কমরেড মনসা মেটেকে সম্পাদক করে ২১ জনের কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।

ঐ দিন বিকাল ৪টায় পাণ্ডুক হাটতলায় প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সারা ভারত কৃষক খেতমজুর সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড খোদাবক্স গ্রাম বাংলার মানুষের উপর বুর্জোয়া শ্রেণী ও তাদের স্বার্থবাহী দলগুলির আক্রমণের বিভিন্ন দিক এবং কৃষক স্বার্থবিরোধী কৃষিনীতির উপর বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। এস ইউ সি আই পার্টির জেলা কমিটি সদস্য কমরেড সুনীল পুরকাইত এবং কমরেড সুচেতা কুণ্ডু বক্তব্য রাখেন।

সহস্রাধিক মানুষ দীর্ঘক্ষণ প্রবল আগ্রহ সহকারে বক্তাদের বক্তব্য শোনেন।

পূর্ব মেদিনীপুর

প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধের দাবিতে ঋণগ্রস্ত যুবকদের সম্মেলন

স্বনিযুক্তি প্রকল্পের ভাঁওতা নয় সকল বেকারের কাজ, স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ঋণগ্রহীতাদের উপর প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধ, ব্যর্থ প্রকল্পগুলির ঋণগ্রহীতাদের সমস্ত ঋণ মকুব সহ বিভিন্ন দাবিতে গত ৪ এপ্রিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মারিশদা বাজারে শ্রীমা সিনেমা হলে কাঁথি ৩নং মারিশদা ব্লকের ঋণগ্রহীতাদের সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সুশান্ত মণ্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিরা তাদের প্রকল্পগুলির অবস্থা, ঋণ নেওয়ার সময় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের নানা ধরনের ঘুষ ও দুর্নীতির তথ্য তুলে ধরেন। অধিবেশন থেকে আগামী দিনে আন্দোলন পরিচালনার জন্য গুণধর মণ্ডলকে সভাপতি, প্রদীপ পালকে সম্পাদক এবং অসীম মণ্ডলকে জেলা প্রতিনিধি করে সারা ভারত স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির ১৯ জনের মারিশদা ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

বিকালে মারিশদা বাজারে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন এ আই ডি ওয়াই ও'র মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড তমাল সামন্ত। অন্যান্য যুব সংগঠনগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও তারা উপস্থিত হয়নি। প্রতিনিধি অধিবেশনের ও প্রকাশ্য সভায় স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির জেলা সম্পাদক প্রদীপ দাস ও জেলা সহসভাপতি সুধীর মাইতিও বক্তব্য রাখেন।

রাস্তা নির্মাণে গড়িমসির প্রতিবাদে গণবিক্ষোভ

পাঁশকুড়া ১নং ও ২নং ব্লকের কয়েকটি অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষের ভোগপুর রেল স্টেশন ও ৬নং জাতীয় সড়কে যাওয়ার ৮.৯৫ কিমি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি চওড়া করা ও পিচ করার দাবি এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের। বরদাবাড় থেকে দেড়িয়াচক পর্যন্ত রাস্তাটি প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনাভুক্ত করে ২০০৩-০৪ সালে পীচ রাস্তা নির্মাণের জন্য হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ (এইচ ডি-এ) দায়িত্ব পায়। ২০০৪ সালের জানুয়ারিতে ওয়ার্ক অর্ডারও বেরিয়ে যায়। ২ কোটি ৪২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা বরাদ্দও হয়। ৯ মাসের মধ্যে কাজটি শেষ করার কথা। কিন্তু এইচ ডি এ নিয়োজিত ঠিকাদার মাত্র ৪.৩৫ কিমি রাস্তা তৈরি করার পর কাজ বন্ধ করে দেয়। এর ফলে এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তারা গত ১২ মার্চ এক গণকনভেনশন করে 'বরদাবাড় দেড়িয়াচক রাস্তা উন্নয়ন কমিটি' গঠন করে এবং রাস্তা সম্পূর্ণ করা ও পিচ করার দাবিতে আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই দাবিতে এলাকার হাজার হাজার মানুষের গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে ৫ শতাধিক মানুষ ৮ এপ্রিল তমলুক জেলাশাসক দপ্তরে ও জেলা পরিষদ অফিসে বিক্ষোভ দেখায় এবং ডেপুটেশন দেয়। অতিরিক্ত জেলাশাসক ও জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ প্রতিনিধিদের বলেন — এ বিষয়ে বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার, ঠিকাদারদের নিয়ে বৈঠক হয়েছে। কাজটি দ্রুত শেষ করার জন্য তাঁরা চেষ্টা করবেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমিটির সম্পাদক মধুসূদন বেরা, তপন দুয়ারি, অধ্যাপক ব্রজমোহন নায়েক প্রমুখ। বিক্ষোভ জমায়েতে নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দ্রুত রাস্তা শেষ করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

উত্তর ২৪ পরগণা

দেগঙ্গায় এ আই কে কে এম এস-এর সম্মেলন

প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৫ এপ্রিল দেগঙ্গা ব্লক কে কে এম এস-এর তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। গ্রীষ্মের প্রবল দাবদাহ উপেক্ষা করে প্রায় ২০০ জন কৃষক-খেতমজুর প্রতিনিধি দক্ষিণ কলসুর মিতালী সংঘের মাঠে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। মকুব হওয়া ঋণ ও বেআইনি খাজনা আদায় বন্ধ করা, কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, খেতমজুরের পরিচয়পত্র ও প্রতিশ্রুতি মতো ১০০ দিনের কাজ ও বাঁচার মত মজুরি, সবার জন্য রেশন কার্ড ও সমস্ত গরিব মানুষকে বিপিএল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিনিধি অধিবেশনের সমাপ্তি ভাষণে কে কে এম এসের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস, ব্লকে ব্লকে উপরোক্ত দাবিতে আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। প্রধান বক্তা এস ইউ সি আই-এর উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ বলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই কৃষক ও খেতমজুরদের সমস্যার মূল কারণ, একে উৎখাত করতে হবে।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, কমরেড নুরুল আমিন মণ্ডল ও কমরেড পতিতপাবন মণ্ডল। সম্মেলনে কমরেড আব্দুল রাজ্জাক মণ্ডলকে সভাপতি ও যুগ্মভাবে কমরেডস্ সেকেন্দার মণ্ডল ও সাদেক মণ্ডলকে সম্পাদক করে ২৮ সদস্যের ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

মুর্শিদাবাদ

আন্দোলনের ফলে জঙ্গীপুর মহকুমা হাসপাতালে দাবি আদায়

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির আন্দোলনের চাপে মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমা হাসপাতালে একজন অ্যানাসথেসিস্ট ও একজন অর্থোপেডিক ডাক্তার নিয়োগ হয়েছে এবং আর একজন অ্যানাসথেসিস্ট নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে। ইতিপূর্বে কেবল সকালেই সার্জারি বিভাগে কাজ হতো, এখন বিকালেও অপারেশন করা হচ্ছে। হাসপাতালের মধ্যে ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ হয়েছে, ওষুধের তালিকা টাঙানোর ব্যবস্থা হচ্ছে।

হাসপাতালের সুপার কিছু দাবি পূরণ করলেও শিশু বিভাগে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট এখনও চালু হয়নি, দালাল চক্রের দৌরাত্ম বন্ধ হয়নি। মহকুমা হাসপাতালের অধীন বেসিক প্রাই-মারি হেল্‌থ সেন্টারগুলিতে প্রয়োজনীয় ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ হয়নি। এই দাবিগুলি নিয়ে ৬ এপ্রিল সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমিটির সম্পাদক ডাঃ রবিউল আলম। সুপার দাবিগুলি পূরণের জন্য যথাযথ ভূমিকা নেবেন বলে আশ্বাস দেন।

খিচুড়ির প্রসাদে স্কুল-ছুট কমবে না

সম্প্রতি রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মিড-ডে মিল বা দুপুরে রান্না করা খাবার দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রায় প্রতিদিনই নানারকম অপ্রীতিকর খবরাখবর পাওয়া যাচ্ছে। ক'দিন আগে বাঁকুড়ার পাত্রসায়রে একটি স্কুলের তালা ভেঙে চুরি হয়ে গেছে রান্নার বাসনকোসন। মিড-ডে মিলের জন্য বাজার করতে গিয়ে ১৬ হাজার টাকা লোপাট হয়ে গেছে মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গায়। অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে গ্রাম শিক্ষা কমিটির সভানেত্রীর আত্মীয়াকে (আনন্দবাজার ৯-২-০৫)। শুধু চুরি-দুর্নীতির ব্যাপারই নয়, রান্নার জন্য লোক নিয়োগকে কেন্দ্র করে যথারীতি গড়ে উঠেছে স্বজনপোষণ ও দলবাজি। বহু জায়গায় রাঁধুনির জাত-গোত্র নিয়েও মাথাচাড়া দিয়েছে মধ্যযুগীয় অস্পৃশ্যতা বা জাতপাতের লড়াই। রান্না করার সময় খাবারে টিকটিকি পড়ায় বহু ছাত্রের অসুস্থতার খবরও পাওয়া গেছে। এখন কেবল রান্নার আগুনে শিশুদের জীবন্ত দগ্ধ হওয়ার খবরটাই আসতে বাকি। শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রতিটি মানুষই এখন একবাক্যে স্বীকার করছেন যে, বিদ্যার্থীদের জন্য বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে খিচুড়ির ব্যবস্থা করতে গিয়ে অদ্ভুত এক জগাখিচুড়ি অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। লাটে উঠতে চলেছে পড়াশোনার পাঠ। এই অবস্থার দায় অবশ্য মিড-ডে মিলের ঘাড়ে চাপাবার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় আমাদের নেই। আমরা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যাহ্নকালীন আহার দেওয়ারও আদৌ বিরোধী নই। বিশেষত গ্রামাঞ্চলের যে সমস্ত স্কুলে গরিব ঘরের শিশুরা পড়াশোনা করে, সেখানে দুপুরে ভরপেট খাবার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না। কিন্তু এর জন্য যে পরিকাঠামো প্রয়োজন তার ব্যবস্থা না করে নিয়ম রক্ষা করতে গিয়েই যত বিপত্তি।

মহামান্য উচ্চতম আদালতের এক নির্দেশে বলা হয়েছিল যে, ২০০৩ সালের মধ্যে সারা দেশের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য দুপুর বেলায় রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর ২০০৩ সাল চলে গেছে। চলে গেছে ২০০৪ সালও। আমাদের এই করিৎকর্মা অগ্রণী রাজ্যে উচ্চতম আদালতের ওই নির্দেশ কার্যকরী হয়নি। আদালত ফের নির্দেশ জারি করে বলে যে, ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে রান্না করা খাবার দিতেই হবে। এবার রাজ্য সরকার জেলাশাসকদের মাধ্যমে 'কড়া পদক্ষেপ' নেয়। সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে নির্দেশ পাঠিয়ে জেলাশাসকরা বলেন, যেভাবেই হোক জানুয়ারি মাসের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের রান্না করা খাবার অর্থাৎ খিচুড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করতেই হবে। নির্দেশ পেয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েন প্রায় সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাই। দুশ্চিন্তা তাড়া করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকেও। কারণ, ৫ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের রান্না করা, খাবার দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। তাদের দুশ্চিন্তা, একই স্কুলে কেউ খাবে, কেউ খেতে পাবে না — বিশেষত ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে যখন বয়স ও মানসিকতার ফারাক খুবই সামান্য। এই দোটানায় পড়ে অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই এখনও রান্নার আয়োজন করে উঠতেই পারেনি। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি কি পেরেছে? না, তারাও সবাই পারেনি। যারা শুরু করেছিল তারাও এখন বন্ধ করতে পারলে বাঁচে। কোথাও পরিকাঠামোর অভাবে, কোথাও অর্থাভাবে এই প্রকল্পে ছেদ ঘটতে চলেছে। দুটো অভাবই রাজ্যের সর্বত্র সমানভাবে প্রকট। সংবাদে প্রকাশ, পুরুলিয়ার মানবাজার-১ নং ব্লকের ২০০টি প্রাইমারি স্কুলের একটিতেও ৪ ফেব্রুয়ারি হাঁড়ি চড়েনি। শিক্ষকেরা ধার-দেনা করে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কোনরকমে চালিয়ে নিয়েছেন। (আ.বা.৫/২) একই অবস্থা মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন ব্লকেও। শিক্ষকেরা নিজেদের বেতনের টাকা থেকে খরচ করে ওই প্রকল্প চালিয়ে আসছেন ৩/৪ মাস ধরে। নিয়মমাফিক বিডিও অফিসে খরচের বিল জমা দিয়েও টাকা পাচ্ছেন না। বিডিওরা বলছেন, ডি এম টাকা না দেওয়া পর্যন্ত তারা টাকা দিতে পারবেন না। অন্যদিকে টাকা না দিতে পারলেও প্রকল্প চালিয়ে যাওয়ার কথা বলছেন বিডিওরা। এই অবস্থায় মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি, রঘুনাথগঞ্জ-১নং, সুতি-১নং সহ কয়েকটি ব্লকে প্রকল্প চালাতে আপত্তি জানানো হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের পক্ষ থেকে। সরকার এবং সরকার বিরোধী, উভয় পক্ষের শিক্ষকেরাই এভাবে নিজেদের মাইনের টাকায় প্রকল্প চালানোর বিরোধী।

খিচুড়ির সমস্যা বহুমুখী। এতদিন শুধু মাসান্তে ছাত্রছাত্রীদের মাথাপিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ (দুই থেকে তিন কেজি) চাল দিয়ে দেওয়া হতো। স্কুলের খাতায় নাম-লেখানো সবাই নির্দিষ্ট দিনে হাজির হতো। চাল নিয়ে কিছু কিছু চুরি-দুর্নীতির কথা শোনা যেত। ব্যস ওই পর্যন্ত। আর হ্যাঁ, ব্লকের স্টোরিং এজেন্টের ঘর থেকে পঞ্চায়েত পর্যন্ত চাল বয়ে আনা এবং স্কুলে স্কুলে তা পৌঁছে দেওয়ার টাকা যোগাড় করতে পঞ্চায়েতগুলো হিমসিম খেত। অনেক ক্ষেত্রেই অর্থ সমস্যা মেটাতে কোপ পড়তো রাস্তার ধারের সামাজিক বনায়নের গাছগুলোতে। এইভাবে মিড-ডে মিলের চালের কল্যাণে কত সরকারি গাছের দফা রফা হয়েছে, তা পৃথক গবেষণার বিষয়। এখন খিচুড়ি রান্নার পর্বে চালটা পঞ্চায়েতে পৌঁছে দিচ্ছে স্টোরিং এজেন্ট। তবে মাপজোক করে না দিয়ে বস্তা গুনে হিসাব দিচ্ছে বলে অভিযোগ আছে। অন্যদিকে ডাল, তেল, লবণ ও হলুদ সরবরাহ করছে ঠিকাদার সংস্থা। ছাত্রদের মাথাপিছু ১০০ গ্রাম চাল আর ডাল, তেল, লবণ, হলুদ, জ্বালানি বাবদ ১টি করে টাকা বরাদ্দ। বলা বাহুল্য, আজকের দুর্মূল্যের বাজারে ঠিকাদারের লাভের কড়ি মিটিয়ে মাথাপিছু এক টাকায় অত কিছু হয় না। বিশেষত জ্বালানি সমস্যায় ইতিমধ্যেই জ্বলতে শুরু করেছেন খিচুড়ি-পাচক শিক্ষকেরা। অনুমান করা কঠিন নয় যে, জ্বালানি সমস্যার সমাধানে কাজে লাগবে পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে থাকা বাকি গাছগুলি। খিচুড়ি রান্নার জন্য নিয়োগ করা হয়েছে মাত্র চারশো টাকা মাস মাইনের রাঁধুনি। তাদেরও মাইনে বাকি পড়ছে মাসের পর মাস। স্কুলের ছাত্র সংখ্যা দুশো-চারশো-ছশো যা-ই হোক না কেন, রাঁধুনি একজনই। তিনি যদি একা অত ছাত্রের রান্না না সামলাতে পারেন, তাহলে সঙ্গে এক-দু'জনকে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে সঙ্গীদের পারিশ্রমিক তাকেই দিতে হবে তার চারশো টাকা মাইনে থেকে। বামফ্রন্টের দীর্ঘ 'সুশাসনের মধ্য দিয়ে' অতুলনীয় গ্রামোন্নয়নের ফলে গ্রামীণ মানুষের এতটাই উন্নতি ঘটেছে যে, এইরকম একটা 'রাঁধুনির চাকরি' পাওয়ার জন্যও বহু জায়গায় হাতাহাতি, ফাটাফাটি কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে! এসব সামাজিক প্রতিক্রিয়ার কথা থাক, ফিরে আসা যাক পরিকাঠামোর কথায়।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, রাজ্যের ৬০ শতাংশ প্রাথমিক স্কুলেরই মাথার উপর চাল বলে কিছু নেই। তাহলে তারা খিচুড়ির জন্য বরাদ্দ চাল-ডাল নিয়ে গিয়ে রাখবে কোথায়? রান্নার বাসনপত্রই বা রাখবে কোথায়? বাকি ৪০ শতাংশের ঘরদোর কিছুটা থাকলেও পর্যাপ্ত জায়গা বা উপযুক্ত নিরাপত্তা কি রয়েছে? এই নিবন্ধের শুরুতে বাঁকুড়ার একটি স্কুলের তালা ভেঙে বাসনপত্র চুরির ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা কোনও একটা জেলার বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গদিপরায়ণ বামপন্থীদের সংস্কৃতি চর্চার দীনতার কারণে রাজ্যে অপরাধপরায়ণতা যে ধরনের উচ্চমাত্রায় উঠে এসেছে তাতে ওই ধরনের ঘটনা যে কোনও দিন যে কোনও জেলায় ঘটতে পারে। ফলে চুরির ভয়ে সিটিয়ে থাকছে স্কুলগুলি। তারা পঞ্চায়েত থেকে তাদের একমাসের মালপত্র নিতে চাইছে না। প্রতি সপ্তাহে একবেলা বা একদিন নষ্ট করে শিক্ষকেরা ছাত্রদের নিয়ে 'মাল' আনতে যাচ্ছেন পঞ্চায়েতে। কারণ, পঞ্চায়েত বলছে, স্কুলে স্কুলে অত কিছু প্রতি সপ্তাহে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। এই বাস্তব সমস্যাকে মাথায় নিয়ে, বহু আড়ম্বর সত্ত্বেও বাস্তবে তাই জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত রাজ্যের ৫১ হাজার স্কুলের মধ্যে মাত্র ১২০০ স্কুলের রান্না করা খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করা গেছে (সূত্র ঃ গণদাবী, ১৪-১-০৫)।

গ্রামাঞ্চলের অভিজ্ঞতা হলো, খিচুড়ি রান্নার শুরু থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা উনুনের চারপাশে ভিড় জমাচ্ছে। তারপর খাওয়া দাওয়া মিটতেই বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু। এইসব দেখেশুনে বহু বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অভিভাবকরা চাইছেন না, খিচুড়ির পাল্লায় পড়ে পঠনপাঠন চুকে যাক। যেমন, উত্তর চব্বিশ পরগণার টাকি রামকৃষ্ণ মিশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন স্বয়ং অভিভাবকরা। অবিলম্বে মিড-ডে মিল বন্ধ না হলে তারা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানো বন্ধ রেখে ধর্মঘট পালন করতে বাধ্য হবেন বলে জানিয়েছেন (বর্তমান, ৮/২)। একই অবস্থা নদীয়ার নবদ্বীপেও। সেখানকার প্রণবানন্দ বিদ্যাপীঠের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নীতীন্দ্রলাল মজুমদার জানিয়েছেন, "গত ৩১ ডিসেম্বর আমাদের স্কুলে পড়ুয়াদের অভিভাবকরা নিজেরা সভা করে জানিয়ে দিয়েছেন, স্কুলে রান্নাবান্না শুরু হলে তাঁরা বাচ্চাদের সরিয়ে নেবেন।" (আনন্দবাজার ৪-২-০৫) জেলায় জেলায় সদ্য সমাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের নির্বাচনেও খিচুড়ি সমস্যা বেশ একটা ছায়া ফেলেছিল। "শহর শিলিগুড়ির সিপিএম প্রভাবিত সংগঠনের কয়েকজন সদস্য জানিয়েছেন, প্রায় প্রতিটি স্কুলেই হাতজোড় করে শিক্ষক-শিক্ষিকারা মিড-ডে মিলের খিচুড়ির হাত থেকে রেহাই চাইছেন।" (আনন্দবাজার ১-২-০৫)

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ এবং এদেশের শিক্ষা নিয়ামকগণ ভেবে নিয়েছেন যে, স্কুলে স্কুলে দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা করলেই স্কুলছুট বা ড্রপ আউটের সমস্যাটা মিটে যাবে। আসলে রোগের মূল কারণে না গিয়ে রোগের উপসর্গ ধরে নিদান বাতলাতে চাইলে এরকমটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। দশ-বারো বছর বয়স হতে না হতেই যেসব শিশুরা ইটভাটায় কাজ করে, দোকানে কাজ নেয়, তারা কি শুধু দুপুরের আহারের জন্যই স্কুলে যাবে? আসলে তারা তো চরম দরিদ্র পরিবারের এক একটি অর্থনৈতিক অবলম্বন। পরিবারের সামগ্রিক দারিদ্র দূর করার পরিবর্তে বিচ্ছিন্নভাবে পরিবারের শিশুকে একবার দু'হাতা খিচুড়ি দিলেই কি তাকে স্কুল ধরে রাখা যাবে? তার বই-খাতা-পোষাক-আষাক কে দেবে? যে সময়টা সে স্কুলের খিচুড়ির জন্য জ্বালানি সংগ্রহে দেবে, সেই সময়টা তার মা-বাবা চাইবে বাড়ির জন্য জ্বালানি সংগ্রহে দিক। চাইবে কোনও না কোনও অর্থনৈতিক কাজে যুক্ত হোক। বিষয়টা বোঝার জন্য ১৭ ফেব্রুয়ারির 'বর্তমান' থেকে একটি সংবাদের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাক। 'বিড়ি বাঁধতে না পারায় বিয়ে আটকে যাচ্ছে' শীর্ষক সরকারি সমীক্ষা নির্ভর ওই সংবাদে বলা হয়েছে, "ঔরঙ্গাবাদ এলাকায় বিয়ের বাজারে হবু পাত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতার চেয়ে বিড়ি বাঁধার পারদর্শিতাই প্রধান বিবেচ্য। ...ফলে মিড-ডে মিল চালু করেও স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা তো বাড়ছেই না, উলটে ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়ছে।" অতএব বোঝাই যাচ্ছে, খিচুড়ির প্রসাদ বিতরণকারী এক্সিকিউটিভ ক্লাসের বিমানযাত্রীদের পক্ষে কোনও দিনই বোঝা সম্ভব নয় যে, এরাজ্যে আজও কেন ৭৩ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী পঞ্চম শ্রেণীতে যাওয়ার আগেই পড়াশোনায় ছেদ টানতে বাধ্য হয়।

(ঝড় পত্রিকার সৌজন্যে, ২১-২৭ ফেব্রুয়ারি, '০৫ সংখ্যা)

বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধির প্রতিবাদে

সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস পালিত

বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধি, জাতীয় বিদ্যুৎনীতি অনুযায়ী ৩০ ইউনিট পর্যন্ত ৫০ শতাংশ ছাড় না দেওয়া, তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপের নীতি প্রয়োগ করে গরিব-মধ্যবিত্ত গ্রাহকের মাশুল অতিরিক্ত বাড়িয়ে দিয়ে বৃহৎ শিল্প ও বহুজাতিক সংস্থার মাশুল কমিয়ে দেওয়া, সর্বোপরি কৃষিতে ব্যাপক হারে মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ১২ এপ্রিল সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবস পালন করা হয়েছে। প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে রাজ্যের সব ক'টি জেলায় ডি ই অফিস এবং এস এস অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে সভা করা হয়। সভা শেষে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের মাশুল বৃদ্ধির ঘোষণাপত্রটি পুড়িয়ে গ্রাহকরা প্রতিবাদ জানায়। কলকাতায় গড় মাশুল না বাড়লেও সাধারণ গৃহস্থ গ্রাহকদের ইউনিট প্রতি মাশুলবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপনীতি প্রয়োগ এবং ৩০ ইউনিট পর্যন্ত ৫০ শতাংশ ছাড় না দেওয়ার প্রতিবাদে সি ই এস সি'র ধর্মতলা, শ্যামবাজার, তারাতলা ও ম্যান্ডেভিলা জোনাল অফিসের সামনে এবং বরানগরসহ বিভিন্ন এলাকায় ক্যাশ কাউন্টারের সামনে প্রতিবাদ সভা করা হয়। ধর্মতলার সভায় এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস বলেন, আন্দোলনের চাপে কমিশন সিইএসসিতে আয়কর নির্ধারণের নিয়ম অনুযায়ী স্ল্যাব চালু করতে বাধ্য হয়েছে। তার ফলে গ্রাহকদের কিছুটা দাম কমেছে। এটা গ্রাহকদের উল্লেখযোগ্য জয়। তিনি বলেন, গরিব-মধ্যবিত্তকে ১ টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ দেবার দাবিতে আমাদের আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে হবে। তিনি জানান, বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে আগামী ১৩ মে জেলায় জেলায় আইন অমান্য করা হবে।

দার্জিলিংয়ে বিক্ষোভ

অ্যাবেকার দার্জিলিং জেলা কমিটির নেতৃত্বে বিদ্যুৎগ্রাহকরা কোর্ট মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল করে শিলিগুড়ি শহর পরিক্রমা করে এবং বেলা ১১টায় কোর্ট মোড়ে এসে বিদ্যুৎমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন ভবেশ দাস, সুপ্রীতি পাল, সরণ থাপা, তপন রাই প্রমুখ। এই বিক্ষোভ জমায়েতে কেন্দ্র ও রাজ্যের সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী বিদ্যুৎনীতির তীব্র সমালোচনা করে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান সংগঠনের জেলা সম্পাদক শঙ্কর পাল।

পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন নিয়ে কেন এই জটিলতা

একের পাতার পর

জন্ম দিয়েছিল। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বামফ্রন্টও সেই ক্ষোভের কারণ প্রশমিত করতে কোন ভূমিকাই নেয়নি। বুর্জোয়াশ্রেণীর অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য দল কংগ্রেস বুর্জোয়া স্বার্থ দেখতে গিয়ে অন্যত্র যেমন জনস্বার্থের প্রতি চূড়ান্ত অবহেলা দেখিয়েছে, পার্বত্যভূমিতেও তাই করেছে। কিন্তু বুর্জোয়াদের শোষণ-বঞ্চনা-অবহেলার বিরুদ্ধে বামপন্থী দল হিসাবে সিপিআই(এম) কোন কার্যকরী আন্দোলন গড়ে না তুলে পার্লামেন্টারি রাজনীতির স্বার্থে যতটুকু আন্দোলন আন্দোলন ভাব দেখানো দরকার, মূলত তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। সরকারে বসার পরেও পাহাড়ের মানুষের ক্ষোভের, বঞ্চনাবোধের কারণ সঠিকভাবে চিহ্নিত করে তা নিরসনের কোন উদ্যোগ নেয়নি। ফলে দীর্ঘ বঞ্চনাবোধের যে আগ্নেয়গিরি তৈরি হয়েছিল বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি জি এন এল এফ তাকেই ব্যবহার করেছে। বলা বাহুল্য, এদেশের বুর্জোয়া দল কংগ্রেস বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থে শোষিত মানুষের ঐক্য ভাঙতে শুরু থেকেই এই আন্দোলনে মদত দিয়ে গেছে। জি এন এল এফ-এর এই আন্দোলনে কংগ্রেসের মদতদানের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল, তা হল এই এলাকায় একটা অস্থির পরিবেশ তৈরি করে একদিকে রাজ্যের শাসক দল সিপিএমের উপর একটা স্থায়ী চাপ সৃষ্টি করা, অন্যদিকে জি এন এল এফের মধ্য দিয়ে নিজস্ব প্রভাব বৃদ্ধি করা।

ফলে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে পাহাড়ে এক রক্তক্ষয়ী অধ্যায়ের সূচনা হয়। জনগণের অত্যন্ত স্বাভাবিক বঞ্চনাবোধে ইন্ধন দিয়ে জি এন এল এফ এই আন্দোলন শুরু করে এবং জনগণের একটা বিরাট অংশ তাতে সামিলও হয়। এই আন্দোলন মোকাবিলায় সি পি এম ফ্রন্ট সরকার চরম স্বৈরাচারী ভূমিকা নিয়েছিল। যে কারণে পাহাড়ের মানুষের মধ্যে বিক্ষোভের জন্ম হয়েছিল সেই কারণগুলি দূর না করে, বরং বুর্জোয়া শাসকদের মতই আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলে প্রশাসনিকভাবে সমস্যার মোকাবিলা করতে গিয়ে নির্মম পুলিশি দমনপীড়ন নামিয়ে আনে। স্বাভাবিকভাবেই এই নিপীড়ন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতৃত্বকেই শক্তিশালী করেছিল এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করার যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছিল। এই পুলিশি নির্যাতনের তীব্র বিরোধিতা করার পাশাপাশি আমাদের দল এস ইউ সি আই 'গোর্খাল্যান্ড সমস্যা প্রসঙ্গে' পুস্তিকায় সমস্যাকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিল কেন জি এন এল এফ-এর আন্দোলন ভ্রান্ত এবং এপথে পাহাড়ের মানুষের সমস্যাগুলির সমাধান হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় আলোচনা আমরা পরে করব।

সুবাস ঘিসিংয়ের ১৬ বছর

১৯৮৮ সালে কেন্দ্র, রাজ্য ও জি এন এল এফ-এর মধ্যে এক ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মধ্য দিয়ে পার্বত্য পরিষদ গঠিত হয়। তারপর থেকে একটানা ১৬ বছর পার্বত্য পরিষদের ক্ষমতায় রয়েছেন জি এন এল এফ নেতা সুবাস ঘিসিং। তাঁর শাসন পাহাড়ের মানুষকে কী দিয়েছে? অন্যান্য অংশের শোষিত মানুষের মতই পাহাড়ের মানুষও কি তীব্র শোষণ-বঞ্চনার শিকার নয়? যে স্বপ্ন দেখিয়ে সুবাস ঘিসিং-এর জি এন এল এফ পাহাড়ের মানুষের একটা বিশাল অংশকে আন্দোলনে আনতে পেরেছিলেন, তাদের সেই স্বপ্ন কি পূরণ হয়েছে? যদি তাই হবে তা হলে পাহাড়ের মানুষের সুবাস ঘিসিং-এর প্রতি মোহভঙ্গ হচ্ছে কেন? আসলে এই দীর্ঘ ১৬ বছরে সুবাস ঘিসিংও পূর্বেকার কংগ্রেস ও সিপিএম সরকারের মতই পাহাড়ের মানুষের জীবনের সমস্যাগুলি দূর করার জন্য কোন পদক্ষেপ নেননি। পাহাড়ের বিশেষ পরিস্থিতির বিচারে যে ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত তা করতে ঘিসিং প্রশাসনও চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। পার্বত্য এলাকার উন্নয়নের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা যেমন প্রয়োজনের তুলনায় কম, তেমনি বরাদ্দকৃত সেই তহবিলেরই কোটি কোটি টাকার নয়ছয়, স্বজনপোষণ হয়েছে, প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ঢুকে গেছে। ফলে ঘিসিং প্রশাসনের বিরুদ্ধে পাহাড়ের মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। এই অবস্থায় যতক্ষণ নির্বাচনে জয়ের ক্ষেত্রে তিনি নিশ্চিত হতে না পারছেন ততক্ষণ তিনি নির্বাচনে যেতে চাইছেন না। বরং তিনি নানা কায়দায় নির্বাচন এড়িয়ে গিয়ে ক্ষমতায় থাকতে চাইছেন।

সি পি এম-কংগ্রেস ও জি এন এল এফ-এর ভূমিকা

এই প্রসঙ্গে সি পি এমের ভূমিকা কী ? জি এন এল এফ-এর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার পথ নেয় সি পি এম। সি পি এম একদিকে বাইরে ঘিসিংবিরোধী একটা ভাবমূর্তি ধারণ করে পাঁচদলীয় জোট গড়ে তুললেও ভেতরে ভেতরে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করেই চলছিল। আবার কেন্দ্রের বন্ধু কংগ্রেস সরকারকে দিয়ে সুবাস ঘিসিংকে ভোটে রাজি করানোরও কৌশল নিয়েছিল। কিন্তু সুবাস ঘিসিং-এর সঙ্গে শুরু থেকে কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠতা গভীর। সামগ্রিক সৌহার্দ্যের পরিধির মধ্যেই সুবাস ঘিসিংকে ব্যবহার করে সি পি এমকে চাপে রাখা কংগ্রেসের কৌশল। কংগ্রেস চায় পাহাড়ে সুবাস ঘিসিংই ক্ষমতায় থাকুন। কারণ সুবাস ঘিসিং-এর দল লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকেই ভোট দেয়। ফলে পাহাড়ে জি এন এল এফ-এর ক্ষমতায় থাকার পেছনে কংগ্রেসের স্বার্থ রয়েছে। সেজন্যই কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সুবাস ঘিসিং-এর চাহিদা মতো তাঁকেই একক প্রশাসক হিসাবে মেনে নিতে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেয়। আর রাজ্য সরকারও তা মেনে নেয়। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করে নানা সুবিধা হাসিলের স্বার্থে সি পি এম সরকার বিনামন্তব্যে তা মেনে নিতে বাধ্য হয়। ফলে কংগ্রেস-সি পি এম ও জি এন এল এফ-এর পারস্পরিক রাজনৈতিক স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও অঘোষিত ঐক্যের জেরে পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন এক জটিল পরিস্থিতির মধ্যে নিমজ্জিত হয়।

সমস্যার কারণ পুঁজিবাদ

এই অবস্থায় 'অবিলম্বে পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন চাই' এটাই প্রধান দাবি। আবার একথাও বাস্তব সত্য যে, পার্বত্য এলাকার জনগণের সমস্যার সমাধান শুধু নির্বাচন হওয়া বা না হওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। স্বাধীনতার ৫৭ বছরের মধ্যে এতগুলি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও কেন অন্যান্য অংশের শোষিত মানুষের মতো পাহাড়ের মানুষদেরও সমস্যার সমাধান হয়নি — এই প্রশ্নে খুব গভীরে মনোনিবেশ করা দরকার।

যুগ যুগ ধরে পার্বত্য এলাকায় বসবাস করছে নেপালীভাষী মানুষ। পার্বত্যভূমির নেপালীভাষী দরিদ্র মানুষগুলি চরিত্রের সততায়, সারল্যে এবং বিশ্বস্ততায় অনন্য। আশির দশকে এই মানুষগুলি হঠাৎ করে চরম মনোভাব নিয়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছে, বিষয়টা এমন নয়। দীর্ঘ শোষণ-বঞ্চনা, চরম অর্থনৈতিক সঙ্কট, গোষ্ঠীগত আহত অবমাননাবোধ সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনুপস্থিতির কারণে তাদেরকে ক্রমাগত বিচ্ছিন্নতার দিকে চালিত করেছে।

স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ৩০ বছর কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় থাকলেও পার্বত্য এলাকার সমস্যা সমাধানের দিকে নজর দেয়নি। পাহাড়ে বনজ সম্পদকে ভিত্তি করে শিল্প গড়ে তোলা যেত, কংগ্রেস সেদিকে কোন নজর দেয়নি। পাহাড়ের খরস্রোতা নদীকে ভিত্তি করে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠতে পারত, বিশ্বখ্যাত দার্জিলিং চায়ের বাগান সম্প্রসারিত করে এবং পর্যটন শিল্পকে আকর্ষণীয় করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেত; কিন্তু সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে তা গড়ে ওঠেনি। বুর্জোয়া সরকারগুলির একটানা ঔদাসীন্যে পাহাড়ে বেকার সমস্যার লাঘবেরও কোন চেষ্টাই হয়নি। ফলে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট পাহাড়ের জনজীবনকে জেরবার করে দেয়। অন্যদিকে, পাহাড়ে পশমী পোষাক তৈরির এবং অন্যান্য যেসব কুটির শিল্প ছিল, বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে সেগুলি কোণঠাসা হয়ে যায়। বৃহৎ পুঁজির দাপট এবং পুঁজিবাদী দলগুলির সীমাহীন অবহেলায় পার্বত্য এলাকার অর্থনৈতিক সমস্যা গুরুতর রূপ নেয়। সি পি এম নেতৃত্বও রাজ্যের সরকারে বসার পর পাহাড়ের সমস্যা লাঘব করার জন্য কোন উদ্যোগই নেয়নি। সি পি এম যদি একটি যথার্থ মার্কসবাদী দল হত, সরকার পরিচালনায় প্রকৃত বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলত তাহলে পাহাড়ের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ বাড়াত, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেও পাহাড়ের মানুষের বিশেষ সমস্যাগুলির তীব্রতা লাঘব করার জন্য যা যা করা যায় সেগুলি করত, অপরদিকে ধৈর্যের সাথে পাহাড়ের মানুষকে বোঝাত, কীভাবে সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের সামনে দেশের বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। এই দিকটি সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে সি পি এম নেতৃত্বের উচিত ছিল, মূল শত্রু পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত অংশের শোষিত মানুষের সঙ্গে পাহাড়ের শোষিত মানুষেরও ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করা। কিন্তু সি পি এম সেটি না করে 'দুনিয়ার শ্রমিক এক হও' স্লোগানের বৈপ্লবিক তাৎপর্য সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত না করে তোতাপাখির মত কেবলই তা আওড়ে গেছে এবং একমাত্র নির্বাচনী স্বার্থের দিকে তাকিয়ে সংগঠনে লোক জড়ো করেছে। সেই কারণে পাহাড়ে সি পি এমের গণভিত্তি থাকলেও সেই গণভিত্তি পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিল না। ফলে, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি যখন জনগণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে মাথাচাড়া দেয় তখন এক ধাক্কায় সিপিএমের সংগঠন ভেসে যায়।

পৃথক রাজ্যের দাবি অবৈজ্ঞানিক

এখন যে প্রশ্নটি খুবই প্রাসঙ্গিক তা হল, সুবাস ঘিসিং-এর দিকে এইভাবে জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ ধাবিত হয়েছিল কেন? কী দাবি তুলেছিলেন সুবাস ঘিসিং? সুবাস ঘিসিং-এর দাবি ছিল পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্য চাই। পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্য হলে চাকরি মিলবে, অর্থনৈতিক সঙ্কট দূরীভূত হবে — এই স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন সুবাস ঘিসিং। কিন্তু পৃথক রাজ্য হলেই কি বেকার সমস্যার সমাধান হয় ? তাহলে অন্যান্য রাজ্যগুলিতে বেকার-সমস্যা কেন ? নতুন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেশ কিছু রাজ্য গঠিত হলেও কেন সেখানকার সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান হয়নি, বরং এই রাজ্যগুলিকে কেন আর্থিক সাহায্যের জন্য কেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় — এইসব প্রশ্নের কোন উত্তর সেদিন সুবাস ঘিসিং জনসাধারণের সামনে রাখেন নি। সুবাস ঘিসিং-এর মতো ক্ষমতালোভী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির কাছে তা আশাও করা যায় না। তা সত্ত্বেও এই দাবির পক্ষে একটা বিশাল সংখ্যক নেপালীভাষী মানুষ যে সমর্থন জানিয়েছিল তার পেছনে রয়েছে এক বেদনার ইতিহাস।

আশির দশকে মেঘালয় সরকার নেপালীভাষীদের নির্বিচারে বিদেশি বলে চিহ্নিত করে নির্মমভাবে বিতাড়িত করছিল এবং তারও আগে ১৯৭৯ সালে বুর্জোয়াদের অপর দল জনতা সরকারের প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে নেপালী ভাষাকে বিদেশি ভাষা হিসাবে অভিহিত করেছিলেন — সেই ঘটনা নেপালীভাষী ভারতীয়দের মধ্যে গভীর উৎকণ্ঠার জন্ম দিয়েছিল। আমাদের দল এস ইউ সি আই সেদিন এর তীব্র বিরোধিতা করে বলেছিল, এদেশে বসবাসকারী নেপালীভাষীরা পুরোপুরি ভারতীয় এবং নেপালী একটি উন্নত ও বিকাশশীল ভাষা। এই ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাবার পূর্ণ অধিকার আছে (প্রোলেটারিয়ান এরা ১৬-৬-৭৯)। বুর্জোয়া দলগুলির এহেন দায়িত্বজ্ঞানহীন ভূমিকার জন্য নেপালীভাষীদের মনে যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল সেটাই সুবাস ঘিসিং-এর পৃথক রাজ্যের দাবির পিছনে ব্যাপক জনগণকে টেনে আনে। কিন্তু এমন নজির অসংখ্য যে বুর্জোয়া দলগুলির দ্বারা অথবা অগ্রসর উপজাতিগুলির দ্বারা আপেক্ষিক অর্থে অনগ্রসর উপজাতিগুলির প্রতি যে বঞ্চনা-অবমাননা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় দেখা যায় — তা কখনই দূরীভূত হয়না বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বা পৃথক বুর্জোয়া রাজ্য গঠনের দ্বারা। তাছাড়া পৃথক রাজ্য গঠনের দ্বারা জনজীবনের অন্যান্য মৌলিক সমস্যার সমাধানও সম্ভব নয়। কারণ, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পৃথক রাজ্যটিও পুঁজিবাদী হওয়ার ফলে সেখানে পুঁজিবাদী শোষণমূলক অর্থনীতিই কাজ করে। আর পৃথক রাজ্যের বুর্জোয়া কেয়ারটেকার হিসাবে এইসব রাজ্যের মন্ত্রীরা বুর্জোয়াদেরই সেবা না করে টিকে থাকতে পারেনা। সেই কারণে পৃথক রাজ্য গঠনের দ্বারা বুর্জোয়া শোষণ-বঞ্চনা-অবমাননার কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

গোষ্ঠীগত অবমাননার নেপথ্যে

এখন প্রশ্ন হল, বহু উপজাতি অধ্যুষিত ভারতবর্ষে অগ্রসর উপজাতিগুলির দ্বারা অনগ্রসর উপজাতিগুলির প্রতি যে অবমাননার ঘটনা ঘটছে তা ভারতবর্ষের জাতিগঠনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দূরীভূত হল না কেন? এবং কীভাবেই বা দূরীভূত হওয়া সম্ভব? এর কারণ সঠিকভাবে চিহ্নিত করে গেছেন এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি দেখিয়েছেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এদেশে জাতিগঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই আন্দোলনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাভাষী উপজাতিগুলি প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে যুক্ত হলেও জাতীয় স্বাধীনতার চেতনা তাদের একসূত্রে গ্রথিত করেছিল। কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব মূলত ভারতের অপেক্ষাকৃত অগ্রসর বিশেষ কতকগুলি উপজাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে থাকার ফলে অনগ্রসর উপজাতি সম্পর্কে নেতৃত্ব বৃহৎ জাতিসুলভ মনোভাবের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি। তাছাড়া নেতৃত্ব বর্ণ, ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতাবাদের প্রভাবও কাটাতে পারেনি। পারেনি, কারণ, ভারতে যখন জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয় সেই সময় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ ক্ষয়িষ্ণু এবং মুমূর্ষু স্তরে উপনীত হয়েছে। শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ঘটিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হয়েছে এবং তারই প্রভাবে দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা বেড়েছে। এই অবস্থায় ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বুর্জোয়া নেতৃত্ব লড়াইকে এমন স্তরে উন্নীত হতে দিতে পারে না যার পরিণামে শ্রমিক বিপ্লব হয়ে যায়। ফলে বুর্জোয়া নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধিতার প্রশ্নে আপসমুখী রূপ পরিগ্রহ করে। তাই নেতৃত্বের পক্ষে জাতীয়তাবাদকে বর্ণ, ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার প্রভাব মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলন সৃষ্টি করাও সম্ভব হয়নি। পার্বত্য উপজাতীয়দের দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হিসাবে দেখার যে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রীতিকর ঘটনাগুলি ঘটছে তার শিকড় এখানেই নিহিত। আরও পরিতাপের বিষয় হল, স্বাধীন

পাঁচের পাতায় দেখুন

জীবিত ও মৃত পোপকে সাম্রাজ্যবাদীরা কীভাবে ব্যবহার করেছে

একের পাতার পর

সংবাদসাগরে তা ছিল বিন্দুর মতো।

পোপের আয়ুষ্কালকে দীর্ঘায়িত করার মেডিকেল পদ্ধতি থেকে শুরু করে স্যাটেলাইট, টেলিভিশন, রেডিও ও ইন্টারনেটের মধ্য দিয়ে গোটা দুনিয়ায় অতি দ্রুত পোপের স্বাস্থ্যের খবর জানিয়ে দেওয়া, হাজার হাজার শোকার্ত মানুষকে সড়ক, আকাশ ও সমুদ্রপথে দ্রুত ভাটিকানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সবরকম পরিবহনের ব্যবস্থা রাখা ইত্যাদি আধুনিক বিজ্ঞানের যাবতীয় সাফল্যকে সমবেত করা হয়েছিল কেবলমাত্র একথাটাই জনগণকে বিশ্বাস করাতে যে, এই একজন ব্যক্তির বেঁচে থাকা ও মারা যাওয়া বিশ্বের পক্ষে একটা সাধারণ ব্যাপার নয়, এর ফলাফল অসামান্য, এমনকী অতিপ্রাকৃতও বটে!

কিন্তু পরিহাসের বিষয় হচ্ছে, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বৈপ্লবিক অগ্রগতির উপর নির্ভর করেই আধুনিক শিল্পের বিকাশ শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীকে পাহাড় প্রমাণ সম্পদ এনে দিয়েছে; অথচ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই বিকাশ সম্ভবই হত না যদি সামন্তী সমাজব্যবস্থায় মানুষের জীবনের উপর — মানুষ কী ভাববে, কী বলবে, তার উপর চার্চের সর্বময় কর্তৃত্বকে শ্রেণীগত ও আদর্শগত সংগ্রামের দ্বারা ভেঙে ফেলা না যেত। চার্চের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রেনেশাঁসের বিজয়ই ধর্মান্ধতার শিকল ভেঙে প্রকৃতিবিজ্ঞানকে মুক্ত করেছিল, যার ফলেই পরবর্তী পর্যায়ে উৎপাদন যন্ত্রের বিপুল বিকাশ সম্ভব হয়েছে, যেটা সমগ্র বিশ্বকেও বদলে দিয়েছে।

আমেরিকার শাসকশ্রেণী বহু বহু দশক ধরে নিজেদের সাদা চামড়ার অ্যাংলো স্যাক্সন প্রোটেস্টান্ট রূপেই পরিচয় দিয়েছে, ক্যাথলিক ও ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের ঘৃণার চোখে দেখেছে যাদের অধিকাংশই সেদেশে এসেছিল দরিদ্র অভিবাসী হিসেবে। মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মের মানুষরা শাসকদের ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে একজন ক্যাথলিকের বসতে প্রায় দুশো বছর লেগেছে। যদিও সেই প্রার্থীকে অবশ্যই কোনও বিশাল সম্পদশালী ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান পরিবার থেকে আসতে হয়। কিন্তু তার দ্বারা আমেরিকায় বর্ণ ও ধর্মবিদ্বেষ দূর হয়নি। সাদা চামড়ার শ্রেষ্ঠত্বের ধ্বজাধারীদের আক্রমণের শিকার কৃষ্ণাঙ্গদের মতোই ক্যাথলিক ও ইহুদিদেরও হতে হয়েছে।

পোল্যান্ড ও পোপ

সাম্প্রতিককালে, বিশেষত দ্বিতীয় জন পল পোপ হওয়ার পর, তার ব্র্যান্ডের ক্যাথলিকবাদের মধ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কর্তারা তাদের নিজস্ব বিশ্ব পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার প্রয়োজনীয় একটি হাতিয়ার খুঁজে পায়। পোপের মুখে শান্তির বার্তা, মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে তার বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও এই পোপের সঙ্গে ঘর বাঁধতে সাম্রাজ্যবাদীদের অসুবিধা হয়নি। আসলে এই পোপ যেভাবে কমিউনিজমের বিরুদ্ধতায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন, বা বিভিন্ন দেশে, বিশেষত ল্যাটিন আমেরিকায় 'মুক্তির ধর্ম' (liberation theology) প্রচারকারী ক্যাথলিকদের পোপ যেভাবে ঠাণ্ডা করে দিয়েছেন, সেটাই তাঁকে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছের লোক করে দেয় — তা সেই সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা কেউ প্রোটেস্টান্ট, ক্যাথলিক বা ইহুদিই হোন, কিংবা ধর্মে অবিশ্বাসী ব্যক্তিই হোন।

দ্বিতীয় জন পল অর্থাৎ ক্যারল জোসেফ বয়টিওয়া হচ্ছেন প্রথম পোলিশ ক্যাথলিক যিনি পোপের আসন পান। তাঁকে যখন ঐ পদের জন্য বেছে নেওয়া হয় তখন পোল্যান্ডের কৃষিব্যবস্থা, শোধনবাদী নেতৃত্বের ক্রিয়াকলাপে ভয়ঙ্কর সংকটে, খাদ্যসমস্যা চরম আকার নিচ্ছে। জনগণের ক্ষোভ ক্রমেই পার্টি ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তীব্র হচ্ছে।

এই অবস্থায় ক্ষমতা পাওয়ার ৮ মাসের মধ্যেই ১৯৭৯ সালে নতুন পোপ আবার পোল্যান্ডে যান এক বিশাল জনসমাবেশে যীশুর বাণী প্রচারের জন্য। ঐ সভাতেই তিনি পোল্যান্ডের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার (যেটা শোধনবাদী নেতৃত্বের ক্রিয়াকলাপের ফলে ভিতর থেকে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল) বিরুদ্ধে সরাসরি জেহাদ ঘোষণা করেন। এই ঘটনার ঠিক এক মাস পরেই আমেরিকার বিভিন্ন শহরে পোপকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়। প্রধান প্রধান শহরে অফিস-স্কুল-কলেজে অঘোষিত ছুটি হয়ে যায়। ক্যাথলিক চার্চের কোনও প্রতিনিধিকে ইতিপূর্বে আমেরিকায় এমন ভক্তিপূর্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়নি।

ওদিকে পোল্যান্ডে প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ে। সি আই এ'র সাথে ঘনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের সাহায্যে এবং প্রেসিডেন্ট রেগন ও মার্কিন পুঁজির পূর্ণ মদতপুষ্ট আমেরিকার একমাত্র "ইউনিয়ন" এ এফ এল-সি আই ও'র মদতে পোল্যান্ডের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সলিডারিটি আন্দোলনকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আমেরিকার এই 'ট্রেড ইউনিয়নটি'র সাথে পোল্যান্ডের সলিডারিটির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে দেওয়ার কাজে পোপ ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র বা 'লিঙ্ক'।

আজ পোল্যান্ড আবার বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারের অংশে পরিণত হয়েছে। পোল্যান্ডের ছোট ছোট কৃষি খামার, যারা সমাজতান্ত্রিক যৌথ খামার ব্যবস্থার বিরুদ্ধতা করেছিল, পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতার শিকার হয়ে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। পোল্যান্ডের কৃষকরা আজ যখন রাস্তা অবরোধ করে বা অন্যান্য উপায়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে, সেই খবরে বিশ্বের সংবাদমাধ্যমগুলো বা চার্চের কোনও মাথাব্যথা নেই, তার প্রতি কোনও দৃষ্টিও তারা দেয় না। ১৯৯৯ সালের সর্বশেষ হিসাবে দেখা গিয়েছে পোলিশ জনসংখ্যার প্রায় ২৫ শতাংশ নিযুক্ত কৃষিতে, অথচ দেশের মোট উৎপাদনে (জি ডি পি) কৃষির ভাগ মাত্র ৬ শতাংশ। একদিন সলিডারিটি যেসব জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রগুলিতে ঘাঁটি করতে পেরেছিল, আজ সেগুলি হয় বন্ধ হয়ে গেছে, না হয় পশ্চিমী কোম্পানিকে বেচে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম ইউরোপের দেশে দেশে দেহব্যবসায় পোলিশ নারীদের ভাল সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়।

মধ্য আমেরিকা ও 'মুক্তির ধর্ম'

দ্বিতীয় পল যখন ক্ষমতায় বসেন মধ্য আমেরিকায় তখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট বিশাল বিশাল জোতদারদের রাজনৈতিক ফাঁস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দেশে দেশে চাষী ও শ্রমিকদের আন্দোলন চলছে, তারা জনমুখী শাসন চাইছে।

ঐসব দেশে চার্চের ক্ষমতার কাঠামোয় নীচুতলায় থাকা যেসব ধর্মযাজকরা বিশেষ করে গরিব মানুষের মধ্যে কাজ করতেন, তাঁরা জনগণের এই দুর্দশা ও তার থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষার সাথে একাত্ম হয়ে যান, তাঁদের ধর্মপ্রচারের মধ্যে জনগণের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হতে থাকে। নিকারাগুয়া, এল সালভাদর ও গুয়াতেমালা প্রভৃতি দেশের এই 'মুক্তির ধর্ম' প্রচারকরা দাবি করতে থাকেন যে, ক্যাথলিক চার্চের উপরমহলের কর্তারাও জনগণের এই সংগ্রামকে সমর্থন জানান। কিন্তু তা না করে দ্বিতীয় জন পল ভাটিকানে 'মুক্তির ধর্ম' প্রচারকারীদের সমস্ত প্রভাব নির্মূল করার যাবতীয় ব্যবস্থা নেন। ধর্মযাজকদের এ ধরনের সামাজিক ভূমিকাকে এক ধরনের মার্কসবাদ আখ্যা দিয়ে তিনি ল্যাটিন আমেরিকায় বেছে বেছে এমন বিশপদের পাঠান যারা ওখানকার চার্চকে সামাজিক আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় পল পোপ হওয়ার দুবছর পর ১৯৮০ সালে এল সালভাদরে, সামাজিক কাজকর্মে সক্রিয়ভাবে যুক্ত আর্চবিশপ অসকার রোমেরোকে যখন দক্ষিণপন্থীদের মদতপুষ্ট ঘাতকদের দিয়ে খুন করা হয়, মিলিটারির দ্বারা নান্‌রা ধর্ষিত ও নিহত হতে থাকেন, তখনও ভাটিকান মৃদু প্রতিবাদ জানিয়েই দায়িত্ব শেষ করে। দ্বিতীয় জন পলের আমলেই ভাটিকানে রক্ষণশীলতার ফাঁসকে আরও দৃঢ় করা হয়। মহিলাদের ও বিবাহিত পুরুষদেরও ধর্মযাজক পদে নিয়োগের জন্য ১৯৯৭ সালে আড়াই লক্ষ জার্মান ও আমেরিকান ক্যাথলিকদের দাবিকে তিনি নাকচ করে দেন।

একটি পত্রিকা লিখেছে, ধর্মযাজক হওয়ার আগে বয়টিওয়া একজন অভিনেতা ছিলেন। শ্রোতাদের মুগ্ধ করার কাজে তিনি ঐ দক্ষতার ভালই ব্যবহার করেছেন। এজন্যই তিনি জানতেন ক্যামেরার সামনে, এমনকী গুরুতর অসুস্থতার সময়ও কীভাবে আচরণ করতে হয়।

কিন্তু কেবল এই দক্ষতা ও পুঁজিবাদী মিডিয়ার প্রচার দিয়েই সাধারণ মানুষের মধ্যে তার প্রবল জনপ্রিয়তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এখানেই আমাদের স্মরণ করতে হবে কার্ল মার্কসের কথা, যিনি ধর্মকে বলেছিলেন, "জনগণের জীবন-যন্ত্রণাকে সহনীয় করার আফিম।" একথার দ্বারা তিনি এই সত্যের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, পুঁজিবাদ সর্বদিক দিয়ে মানুষের জীবনকে অসহ্য যন্ত্রণাময় করেছে এবং ধর্ম সেখানে, পরলোকের গল্পকথা দিয়ে হলেও মানুষকে সান্ত্বনা ও আশার বাণী শুনিয়েছে। মার্কসের পুরো কথাটি হল — "ধর্ম হচ্ছে শোষিত জনগণের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন দুনিয়ায় হৃদয়বৃত্তির বাণী, বিবেকবর্জিত সমাজে বিবেক, ধর্ম হচ্ছে জনগণের জীবনযন্ত্রণাকে সহনীয় করার আফিম।"

এই শব্দগুলি পাঠ করার সময় আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যা কিছু বর্বরতা, তা সবই আমাদের জীবনকে ঘিরেই। তবুও ভেঙে না পড়ে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে প্রতিদিন চেষ্টা করে যেতে হয়। মৃত্যুর পরে স্বর্গে যাওয়ার বিশ্বাস থেকেই হোক, অথবা মদ ও ড্রাগের নেশায় নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েই হোক, মানুষ দুঃখ-যন্ত্রণা-হতাশাকে সহ্য করে ও নানা উপায়ে একে অপরের দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

চার্চের উপরমহলে আরাম ও ভোগবিলাসের যদিও কোনও অভাবই ছিলনা, তবুও ধরে নেওয়া যাক, জন পল যখন পুঁজিবাদী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিরুদ্ধে বাণী দিতেন, তাঁর মধ্যে আন্তরিকতা ছিল। তিনি জনগণকে বলেছেন, জীবনের বস্তুগত চাওয়া-পাওয়ার উপরে আধ্যাত্মিকতাকে স্থান দিতে। বাস্তবজগতে এর অর্থ দাঁড়ায় শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বৈষম্যকে মেনে নেওয়া। অর্থাৎ গরিব চিরকালই গরিব থাকবে, কিন্তু এ জীবনে গরিবি থেকে মুক্তির কথা না ভেবে আধ্যাত্মিক মুক্তির চিন্তায় খেটে যাওয়াটাই তার কর্তব্য।

মার্কস দেখিয়েছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ। তিনি নতুন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার, মানব পরিবারের মধ্যে ভালবাসা ও সংহতি গড়ে তোলার জন্য এক উন্নততর সমাজব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। যে শ্রমিকরাই উৎপাদনযন্ত্রগুলি তৈরি করে তাদের হাতেই সেই উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে ঐ উন্নত সমাজ গড়ে উঠতে পারে এবং একমাত্র বিপ্লবী

আটের পাতায় দেখুন

পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন

চারের পাতার পর

ভারতের বুর্জোয়া সরকারগুলি তাদের শ্রেণী শাসন ও শোষণ অব্যাহত চালিয়ে যাওয়ার জন্য শোষিত মানুষের ঐক্যের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে ধর্ম, বর্ণ সহ নানাধরনের বিভেদগুলি খুঁচিয়ে তুলছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বুর্জোয়ারাই পৃথক রাজ্য গঠনের মধ্য দিয়ে জনগণের ঐক্যের সামনে প্রাদেশিকতার বাধার প্রাচীর তুলে দিচ্ছে। ফলে উপজাতীয় মানুষের অবমাননা, শোষণ প্রভৃতি যে বিষয়গুলি তাদের নানাভাবে পীড়িত করছে তার কবল থেকে যথার্থই মুক্তি পেতে হলে, পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ না করে কি সম্ভব — এই প্রশ্নটি সকলেরই গভীরভাবে অনুধাবন করা দরকার।

উন্নয়নের দাবিতে লড়াই আশু প্রয়োজন

নিপীড়িত জাতি বা উপজাতিগুলির মুক্তি কীভাবে সম্ভব এই প্রশ্নে মহান স্ট্যালিন বলেছেন, এই মুক্তি পেতে হলে বুর্জোয়াদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে হবে এবং শ্রমজীবী জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে। স্ট্যালিনের নিজের ভাষায়, "সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করে নিপীড়িত জাতিগুলির বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত না করে ঐ জাতিগুলির শ্রমজীবী মানুষদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়।" (অক্টোবর বিপ্লব ও জাতিসমস্যা — স্ট্যালিন)।

সেই কারণে আমরা আগেই বলেছি, দার্জিলিং সমস্যার সমাধান এই মৌলিক প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে শুধু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে হতে পারেনা। এই দৃষ্টিকোণ নিয়ে সি পি এম পাহাড়ের সমস্যা মোকাবিলায় না গিয়ে অপেক্ষা করেছিল কখন বুর্জোয়া শাসনের ধারায় জি এন এল এফ জনপ্রিয়তা হারায়, আর তারই সুযোগে নির্বাচনে তাদের পরাজিত করে ক্ষমতাসীন হওয়া যায়। এই কারণে একদিকে যেমন তারা কংগ্রেসের সাথে সুসম্পর্ক রাখার স্বার্থে নির্বাচন না করে সুবাস ঘিসিংকে একক প্রশাসক হিসাবে মেনে নিচ্ছে আবার একইসাথে নির্বাচনে ঘিসিংকে পরাজিত করে নিজেরা ক্ষমতায় বসার জন্য পাঁচদলীয় জোটকে সক্রিয় রেখে সুবাস ঘিসিং বিরোধী প্রচারের তীব্রতা বাড়ানোর হুমকি দিচ্ছে। তাদের এই দ্বিচারিতার সঙ্গে পাহাড়ের শোষিত বঞ্চিত মানুষের স্বার্থের কোন সম্পর্ক নেই। বরং এটা তাদের প্রতি চূড়ান্ত প্রতারণারই নামান্তর। এটা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, বুর্জোয়া ব্যবস্থায় এই দ্বিদলীয় পাল্টাপাল্টির রাজনীতি জনজীবনের সমস্যার সমাধান তো করেই না, বরং বুর্জোয়া দল বা বুর্জোয়াদের সেবায় উন্মুখ কোন 'বাম'দলকে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় বসায়। এর মধ্যে শোষিত মানুষের মুক্তি নেই। সারা দেশের শোষিত মানুষের সঙ্গে আজ পার্বত্য এলাকার শোষিত মানুষকেও ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনে সামিল হয়ে পাহাড়ের উন্নয়নের দাবি তুলতে হবে এবং নির্বাচনী লড়াইকেও উন্নয়নের দাবিতেই সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্বে পরিচালিত করতে হবে। এছাড়া পার্বত্য পরিষদের জটিলতা কাটানোর বিকল্প কোন পথ নেই।

ভুল সংশোধন

গণদাবী ৫৭ বর্ষ ৩২ সংখ্যায় সাতের পাতায়, ৪ এপ্রিল কলকাতায় পর্ষদ দপ্তরে বিদ্যুৎগ্রাহকদের বিক্ষোভ ক্যাপশনে ভুলক্রমে ত্রিপুরার ছবি এবং দুয়ের পাতায় ১লা এপ্রিল ত্রিপুরায় বিদ্যুৎভবনের সামনে এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভের ক্যাপশনে কলকাতায় অ্যাবেকার বিক্ষোভের ছবি ছাপা হয়েছে। এই গুরুতর ত্রুটির জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।

এস ইউ সি আই-এর ৫৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে

কমরেড নীহার মুখার্জীর আহ্বান

একের পাতার পর

পরিস্থিতিতে সংগ্রামের সঠিক লাইনের সন্ধান দিয়েছে; এবং এইভাবে পার্টি তার আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব পালন করেছে।

দ্বিতীয়ত, ভারতের সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী অগ্রগামী বাহিনী হিসাবে আমাদের প্রিয় পার্টি জন্মলগ্ন থেকেই শ্রমিকশ্রেণী এবং দেশের শোষিত মেহনতি জনগণের সকল অংশকে, যথা — গরিব ও মধ্যচাষী, মধ্যবিত্ত ও গরিব কর্মচারী, শিক্ষক, ছাত্র, যুবক এবং মহিলাদের নিজ নিজ সংগঠনে সংঘবদ্ধ করার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে এবং সমস্ত রকম শোষণ, নিপীড়ন ও অবক্ষয়ী বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে; যাবতীয় প্রতিকূলতা এবং পুলিশি অত্যাচার সহ্য করে এমনকী জীবন দিয়েও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছে এবং এই সমস্ত সংগ্রামকেই পার্টি উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতির আধারে গড়ে তুলেছে। এই সংগ্রামগুলির মধ্য দিয়ে পার্টি একদিকে দেশের লক্ষ লক্ষ মেহনতি জনগণের মধ্যে একটি নতুন জাগরণ আনার চেষ্টা করেছে, অপরদিকে গণসংগ্রাম কমিটিগুলি গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে জনগণের রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয়, উভয় ক্ষেত্রে এই সংগ্রামগুলিই আমাদের পার্টিকে দেশের কমিউনিস্ট বলে দাবীদার অন্যান্য পার্টিগুলির থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করেছে। আবার, এই সংগ্রামগুলির মধ্য দিয়েই দেশের বিপুল সংখ্যক শোষিত জনগণের সামনে আমাদের পার্টি সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক হিসাবে দেখা দিয়েছে।

আমাদের পার্টিকে লেনিনীয় মডেলে গড়ে তোলার জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে যে সংগ্রামটি পরিচালিত হয়েছিল, যে সংগ্রামই আমাদের পার্টিকে এদেশের মাটিতে যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে দাঁড় করিয়েছে এবং আমাদের পার্টি এমন মহান ভূমিকা পালন করতে পেরেছে, সেই সংগ্রামকে কমরেডদের গভীরভাবে উপলব্ধি করা দরকার। পার্টি সংগঠনের লেনিনীয় নীতি, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে আমাদের পার্টিকে গড়ে তোলবার জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষ পার্টির সকল নেতা ও কর্মীদের যুক্ত করে জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে এক তীব্র সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। পার্টির নেতা ও কর্মীদের আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক মান ক্রমাগত উন্নত করাই ছিল এই সংগ্রামের লক্ষ্য। কারণ, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার যথার্থ কার্যকারিতা নেতা-কর্মীদের আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক উন্নত মানের উপরেই নির্ভর করে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একই সাথে পার্টি যৌথ নেতৃত্বের সুনির্দিষ্ট ধারণার জন্ম দিতে এবং একদল জাত বিপ্লবী গড়ে তুলতে সফল হয়েছে।

একথা কমরেডদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে, পার্টির সকল নেতা ও কর্মীদের যুক্ত করে জীবনের সর্বক্ষেত্র ব্যাপ্ত করে এই তীব্র সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম যেমন একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য, তেমনই পার্টির বিপ্লবী চরিত্র রক্ষা করার ও তার বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রেও এই সংগ্রাম অপরিহার্যই শুধু নয়, বরং এটাই তার একমাত্র গ্যারান্টি।

আমি বিশ্বাস করি, কমরেডরা এর গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করে এই সংগ্রাম নিরলসভাবে চালিয়ে যাবেন।

আজ ক্ষয়িষ্ণু বিশ্ব পুঁজিবাদ সম্পূর্ণরূপে প্রতিক্রিয়াশীল, দুর্নীতিগ্রস্ত এবং তীব্র ও অনিরসনীয় সঙ্কটে জর্জরিত। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীরা এই সঙ্কট থেকে বেরোবার জন্য মরিয়া চেষ্টা চলাচ্ছে। কিন্তু অর্থনীতির সামরিকীকরণ অথবা বিশ্বায়ন কোন কিছুই তাদের এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করতে পারছে না। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি এবং নৈতিকতা ইত্যাদি সকল দিক ব্যাপী পুঁজিবাদের সঙ্কট জন জীবনের সকল ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত সমস্যার সৃষ্টি করে তাদের জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে। বিশ্বের সমস্ত দেশেই বিপ্লবের বাস্তব জমি সকল দিক থেকেই প্রস্তুত। শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদের ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু, পুঁজিবাদ আপনা-আপনি ধসে পড়বে না।

কোন একটি দেশে একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লব করার জন্য আদর্শগত এবং সাংগঠনিক উভয়ক্ষেত্রে উপযুক্ত শক্তি যতদিন না অর্জন করছে, ততদিন পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করা যাবে না। সেই শক্তি অর্জন করতে আমরা এখনও সফল হইনি। আজকের মরণোন্মুখ পুঁজিবাদের আয়ুষ্কাল দীর্ঘায়িত হচ্ছে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক শক্তিগুলির চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতক ভূমিকার জন্য; এরা সর্বদাই শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপসকামী ভূমিকা পালন করে। এই সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক শক্তিই শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শোষিত জনগণের মুক্তিসংগ্রামের সামনে প্রধান বিপদ। এ কারণেই সকল জাতের সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক শক্তিগুলিকে আদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে পরাস্ত না করে আমরা প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদকে পরাস্ত করতে পারব না।

বিপ্লবের এই অপরিহার্য কাজটিও একমাত্র সম্পন্ন হতে পারে সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিবৃদ্ধির দ্বারা। অত্যন্ত আনন্দের কথা, তথা আশার আলো যে, বিশ্বের প্রায় সকল দেশে সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে। বিভিন্ন দেশের পার্টিগুলির মধ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষের রচনাবলী ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর চিন্তাধারার প্রতি যে আকর্ষণ আমরা সৃষ্টি করতে পেরেছি, তাতে এই আশার আলোক আরও উজ্জ্বল হয়েছে। কিছু কিছু পার্টি নিজস্ব উদ্যোগেই যেভাবে কমরেড ঘোষের বইগুলি মাতৃভাষায় অনুবাদ করেছে, তা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। কিন্তু আমাদের সীমাবদ্ধতার দরুন বিশ্বের সকল দেশে যে আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের রচনাগুলি এখনও পৌঁছে দিতে পারিনি, সে ঘটনাও আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। এমনকী আমাদের নিজেদের দেশের অভ্যন্তরেও সকল রাজ্যে সর্বস্তরের মেহনতি মানুষের কাছে আজও আমরা তাঁর চিন্তা নিয়ে পৌঁছাতে পারিনি। অথচ আজ কমরেড ঘোষের চিন্তাকে জানার জন্য জনগণের আগ্রহ ক্রমাগত বাড়ছে, ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদী শোষণ এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আমাদের পার্টির নিরন্তর সংগ্রাম পার্টির প্রতি জনগণের শ্রদ্ধাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলছে, পুঁজিবাদের সর্বাত্মক সঙ্কট শুধু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া দলগুলির আসল চরিত্র উদ্‌ঘাটিত করে দিচ্ছে তাই নয়, সি পি আই এবং সি পি এম-এর মতো দল — যারা মুখে বামপন্থার কথা বলতে বলতেই বাস্তবে বামপন্থার মর্মবস্তুকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে শোষণমূলক ব্যবস্থার রক্ষাকর্তার ভূমিকা নিচ্ছে — তাদেরও মুখোশ খুলে দিয়েছে।

অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে চরম সমস্যার মুখোমুখি হয়ে জনগণের বিক্ষোভ বাড়ছে এবং তা আন্দোলনের আকারে ফেটে পড়তে চাইছে। এসময় বিপ্লবীদের অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে এবং জনসাধারণকে সংগঠিত করতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টিকে এবং সমস্ত গণসংগঠন ও কমসোমলকে নতুন উদ্যমে উজ্জীবিত করা ও সংহত করার সময়োচিত আহ্বান জানিয়েছে, যাতে পার্টি এবং তার গণসংগঠনগুলি এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত শক্তি অর্জনে সক্ষম হয়।

কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, পার্টির ৫৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর ঐতিহাসিক মুহূর্তে পার্টির সমস্ত নেতা ও কর্মীরা কেন্দ্রীয় কমিটির এই আহ্বানকে বাস্তবে রূপায়িত করতে নিজেদের সমস্ত ক্ষমতা উজাড় করে দেবেন।

শত শত কোটি টাকা মুনাফা লুটে নিয়ে যাচ্ছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো

বহুজাতিক পুঁজির চরিত্র বুঝতে না পেরে অথবা বুঝেও বহুজাতিক পুঁজির স্বার্থে আজকাল অনেকেই বলছেন যে, এই পুঁজি বিনিয়োগ হলে দেশের উন্নয়ন হবে, কর্মসংস্থান হবে। দেশের বুর্জোয়া দলগুলি তো বটেই, এমনকী কমিউনিস্ট নামধারী সিপিএম, সিপিআইও প্রকাশ্যে বলছে দেশের উন্নয়নের জন্য বহুজাতিক পুঁজি চাই। এই সমস্বর প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে সাধারণ মানুষও বুঝতে পারছেন না এর বিপদ কোথায়। পঞ্চাশ ষাট-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গে যখন বামপন্থী আন্দোলনের জোয়ার ছিল তখন বহুজাতিক শব্দটিই ঘৃণার উদ্রেক করত, শব্দটি ছিল শোষণের সমার্থক। বহুজাতিক পুঁজিকে ডেকে আনার অর্থ হল শোষণকে ডেকে আনা। কিন্তু দক্ষিণপন্থী ও তথাকথিত বামপন্থী দলগুলি বলছে, বহুজাতিক পুঁজি বিনিয়োগ হলে চাকরিও তো হবে।

দেখা যাক, এবিষয়ে ভারতীয় অভিজ্ঞতা কী। ভারতে যে সমস্ত বহুজাতিক কোম্পানির শাখা রয়েছে, সংবাদে প্রকাশ, গত ২০০৪ সালে তারা বিপুল পরিমাণ লাভ করেছে। হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেড, ভারতে সাবান জাতীয় পণ্যের বাজার যার প্রায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে, তার শেয়ার হোল্ডারদের জন্য ৫০০ শতাংশ ডিভিডেন্ড (লভ্যাংশ) ঘোষণা করেছে। তেমনি জি এস কে ফার্মা ২৪০ শতাংশ, সিনজেন্টা ইন্ডিয়া ১০০ শতাংশ এবং ফসেকো ইন্ডিয়া ৪০ শতাংশ লভ্যাংশ দিতে চলেছে। এই সমস্ত কোম্পানির মূল কেন্দ্র বা মাদার কোম্পানির দখলেই রয়েছে শাখা কোম্পানির অধিকাংশ শেয়ার। ফলে শাখাগুলি যত বেশি ডিভিডেন্ড ঘোষণা করবে ততই মাদার কোম্পানিগুলির ঝুলি ফুলে উঠবে। ফলে এই লভ্যাংশের সিংহভাগই চলে যাচ্ছে বিদেশে। ভারতে পুঁজি লগ্নি করে লাভ বিদেশে লুটে নিয়ে যাওয়াকে কি উন্নয়ন বলে? এতে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিটির মালিকদের বিরাট উন্নয়ন হচ্ছে, কিন্তু এদেশের জনসাধারণের উন্নয়ন হচ্ছে কি? দ্বিতীয়ত, সত্যিই কি বহুজাতিক কোম্পানিগুলিতে চাকরি হচ্ছে? বহুজাতিক কোম্পানিতে একদা কিছু লোকের চাকরি হলেও এদের বিপুল পুঁজির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে দেশিয় বহু শিল্প ধ্বংস হয়ে হাজার হাজার মানুষের কর্মচ্যুতি ঘটেছে। পুঁজির কেন্দ্রীকরণের জন্য বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির সংযুক্তির ফলে কর্মী ছাঁটাই করে মুনাফাবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কয়েক মাস আগে ভিওয়ান্দিতে সনি ইন্ডিয়া ৪০০ কর্মচারীকে ছাঁটাই করেছে। 'বহুজাতিক কোম্পানিতে কর্মরত ভারতীয় শ্রমিক-কর্মচারীদের ভাগ্য ক্রমাগত বেশি বেশি করে বিদেশিদের হাতে চলে যাচ্ছে' — বলেছেন ট্রান্সার্চ (Transearch)-এর পার্টনার অতুল ভোরা। এটা শুধু ভারতেই নয়, চাকরি থেকে বিদায় দেওয়ার ঘটনা বিশ্বব্যাপীই চলছে। চ্যালেঞ্জার, গ্রে এবং খ্রীস্টমাস প্রভৃতি সংস্থা সারা বিশ্বে শুধু গত জানুয়ারি মাসেই ৯২ হাজার ৩৫১ জন কর্মচারীকে বিদায় দিয়েছে। কোম্পানিগুলির সংযুক্তি ঘটিয়ে শ্রমিক ছাঁটাই এবং লেওফ-এর মধ্য দিয়েই প্রাতিষ্ঠানিক খরচ কমানো হচ্ছে এবং লাভের পরিমাণ বাড়ছে। কোম্পানিতে লে-অফ করানো বহুজাতিক কোম্পানিগুলির অস্তিত্বের (কর্পোরেট লাইফের) অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী বেশি বেশি করে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা অর্জনের জন্য বৃহৎ কোম্পানিগুলিতে লে-অফ করতে হচ্ছে। অতি সম্প্রতি ডয়েস ব্যাঙ্ক, ফাইজার, কোডাক ও ক্যাপজেমিনি প্রভৃতি বহুজাতিক সংস্থা লে-অফ ঘোষণা করেছে। জি ই-র মতো বহুজাতিক সংস্থা ভারতে লে-অফকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে এবং প্রতি বছর তার শ্রমশক্তির তলার দিকের দশ শতাংশকে ছাঁটাই করে চলেছে (সূত্র ঃ ইকনমিক টাইমস্ ১৮-২-০৫)। শুধু এটাই নয়, যাঁরা এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতির ধুয়া তুলে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির দ্বারা দেশের উন্নয়নের বাণী ছড়াচ্ছেন, তাঁরা কি অনুগ্রহ করে জানাবেন, প্রতি বছর শত শত কোটি টাকা এদেশ থেকে মুনাফা তুলে নিয়ে যাচ্ছে যে কোম্পানিগুলো, তারা এদেশে কতটুকু ট্যাক্স দেয়?

নদীয়া জেলা কমিটির সদস্য, বিশিষ্ট সংগঠক

কমরেড মিলন মজুমদারের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই নদীয়া জেলা কমিটির এবং ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মিলন মজুমদার ফুসফুসের মারাত্মক সংক্রমণে কলকাতা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে গত ১৭ এপ্রিল দুপুরে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। কমরেড মিলন মজুমদারের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীয়া জেলার সর্বত্র কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া। জেলা কার্যালয়ে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয়, কমরেডরা কালো ব্যাজ ধারণ করেন।

কলকাতায় হাসপাতাল প্রাঙ্গণেই প্রয়াত কমরেড মিলন মজুমদারের মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন — দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় স্টাফ ও সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী, দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য ও ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা, দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুজিত ভট্টশালী এবং এ আই ডি এস ও'র সর্বভারতীয় কমিটির অন্যতম সহসভাপতি ও দলের নদীয়া জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান।

পরদিন সকালে কমরেড মিলন মজুমদারের মরদেহ নিয়ে আসা হয় নদীয়া জেলায় তাঁর বিশেষ সাংগঠনিক কর্মক্ষেত্র নাকাশীপাড়া থানার বেথুয়াডহরীতে। তাঁদের অত্যন্ত প্রিয় কমরেড ও নেতাকে শেষ বারের মত দেখতে দলের অগণিত কর্মী-সমর্থক সহ দলে দলে সাধারণ মানুষ ছুটে আসেন। আপনজন হারানোর ব্যথায় কান্নায় ভেঙে পড়েন গ্রামগঞ্জ থেকে আসা শত শত মহিলা-কিশোরী এবং গরিব সাধারণ মানুষ। দলের জেলা সম্পাদক কমরেড সেখ খোদাবক্স সহ কমরেডস্ গোপাল কর, বসির আহমেদ, জাকিমুদ্দিন সেখ, হররোজ আলি, কমল দত্ত, স্বপ্না দাশগুপ্ত, তপন ঘোষ, দীপক চৌধুরী, প্রবীর দে প্রমুখ জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন লোকাল কমিটি ও গণসংগঠনগুলির জেলা নেতৃবৃন্দ মাল্যদান করেন। বহু সাধারণ মানুষ এবং রাজনৈতিক দল আর এস পি, তার যুব সংগঠন আর ওয়াই এফ ও সি পি এম এল লিবারেশনের থানা কমিটির পক্ষ থেকেও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

বেলা দশটায় মরদেহ নিয়ে আসা হয় কৃষ্ণনগরে দলের জেলা দপ্তরে। জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড মৃণাল দত্ত সহ দলের অন্যান্য নেতা কর্মী এবং সাধারণ মানুষ প্রয়াত কমরেডের মরদেহে মাল্যার্পণ করেন। এরপর নবদ্বীপ শ্মশান ঘাটে সম্পন্ন হয় কমরেড মিলন মজুমদারের শেষকৃত্য। দলের অগণিত কর্মী-সমর্থক দরদীরা অশ্রুসজল চোখে লাল সেলাম জানিয়ে তাদের প্রিয় কমরেডকে শেষ বিদায় জানায়।

কমরেড মিলন মজুমদারের জন্ম অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায়। দেশবিভাগের ফলে তাঁর পরিবার চলে আসে ত্রিপুরায়। পড়াশুনার সূত্রে সেখান থেকে এ রাজ্যের নদীয়া জেলায় মামাবাড়ি এসে তিনি মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা কলেজে ভর্তি হন। বেলডাঙ্গা কলেজেই ডি এস ও'র সঙ্গে যোগাযোগের ভিত্তিতে ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন ১৯৬৮ সালে। কলেজ সংগঠনের নেতৃত্বকারী ভূমিকা গ্রহণ করে তিনি কলেজ ছাত্র সংগঠনের সহ-সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। জেলায় ডি এস ও সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অপরিসীম এবং তাঁর ভূমিকাও পথিকৃতের। ১৯৭৪ সালে ডি এস ও'র প্রথম জেলা সম্মেলনে তিনি সভাপতি পদে নির্বাচিত হন।

এ যুগের অগ্রগণ্য মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, সর্বহারার মহান

নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে এসে ছাত্র রাজনীতির পাশাপাশি তিনিই বেলডাঙ্গা কলেজের বিভিন্ন ছাত্র যোগাযোগকে একত্রিত করে নদীয়া জেলায় এস ইউ সি আই দল গঠনের প্রাথমিক উদ্যোগ ও ভূমিকা গ্রহণ করেন। জেলার নাকাশীপাড়া, তেহট্ট ও কালীগঞ্জ থানার বোধহয় এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে বহু বহুবার কমরেড মিলন মজুমদার যাননি। মামাবাড়ি থেকে পড়াশুনা শুরু করলেও কালক্রমে কবে যে মামাবাড়ি ছেড়ে নাকাশীপাড়ার প্রতিটি ঘরকেই নিজের ঘর করে নিয়েছেন, তা বোধহয় তিনি নিজেও জানতেন না। প্রতিটি ঘরের দুয়ার ছিল তাঁর কাছে অবারিত। আক্ষরিক অর্থেই সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরেই ছিল তার খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা, সাধারণ মানুষ যেমন দিত তাই ছিল তাঁর পরিধেয়। এ নিয়ে তাঁর না ছিল কোন বাহুল্য-বিলাস, না ছিল দীনতার সঙ্কোচ। জটিল তত্ত্বগত আলোচনায় না ঢুকেও দলের মূল রাজনীতিকে সাধারণ মানুষের মাঝে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর আলোচনার মধ্যে এমন একটা আবেদন থাকত, যা মানুষকে দলের রাজনীতির প্রতি, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট করত। জনসাধারণের সঙ্গে, গরিব মানুষের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা ছিল স্বভাবজাত, স্বাভাবিক। তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনদরদী ও পরোপকারী। মানুষের বিপদের সময় তিনি সর্বদা তাদের পাশে দাঁড়াতেন। এজন্য দলমত নির্বিশেষে তিনি সাধারণ মানুষের আপনজন হয়ে ওঠেন। গরিব খেটেখাওয়া মানুষের প্রতি অসীম দরদবোধ থেকেই জেলায় কিছুকাল ধরে তিনি অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে কাজ শুরু করেন, এবং তাঁর প্রচেষ্টাতেই রাজমিস্ত্রী, প্রেসকর্মী, কার্পেন্টার্স ও সুইপারদের ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে। এছাড়াও জেলায় নানা স্থানীয় সমস্যা নিয়ে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে বহু আন্দোলন তিনি গড়ে তুলেছেন।

দলই ছিল কমরেড মিলন মজুমদারের একান্ত ধ্যানজ্ঞান। কলেজ জীবনের সূচনাতেই বাড়ির চাপে ও প্রয়োজনে চাকরি সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং চাকরি পেয়েওছিলেন। কিন্তু দলের জন্যই নিজেকে নিয়োজিত করবেন এই সিদ্ধান্ত নিজেই নিয়ে চাকরি পরিত্যাগ করেন। ট্রেনে বাসে চলার সময়ই হোক, কোনও সামাজিক বা পারিবারিক অনুষ্ঠানেই হোক, যেখানেই তিনি গিয়েছেন, সর্বদাই আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে দলকে নিয়ে গিয়েছেন। কাজ করার জন্য তিনি নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতেন না। নিজ উদ্যোগেই কাজ করতেন। দল কোনও কাজ বা দায়িত্ব দিলে তিনি কখনও 'না' বলতে পারতেন না। অক্লান্ত পরিশ্রমী এই কমরেড প্রবল অভাব ও কষ্টের সময়ও অন্যদের তা বুঝতে দেন নি।

দলের প্রয়োজন ও নেতৃত্বের প্রতি সীমাহীন আনুগত্য কমরেড মিলন মজুমদারের কাছে ছিল প্রায় সহজাত বোধের মত। ১৯৮০ সালে ত্রিপুরায় বন্যাদুর্গতদের জন্য তিনি যখন ত্রাণ নিয়ে যান তখনই কিছু কিছু যোগাযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। সেই যোগাযোগ ধরেই ত্রিপুরায় দলের কাজ শুরু করার জন্য তিনি ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। নেতৃত্বও তাঁকে ত্রিপুরায় দায়িত্ব দেয়। ঐ রাজ্যে কাজের প্রাথমিক পর্বে দলের আগরতলা জেলা কমিটি গঠনের সময় তিনি সম্পাদক নির্বাচিত হন। বহু আন্দোলনও সেখানে গড়ে তোলেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদে ত্রিপুরায় দলের কার্যালয়ে রক্তপতাকা অর্ধনমিত করা হয়। কমরেডরা কালো ব্যাজ ধারণ করেন।

ত্রিপুরায় পার্টি সংগঠন গড়ে ওঠার পর আবার দলের নেতৃত্ব যখনই তাঁকে বিশেষ প্রয়োজনে নদীয়ায় ফিরতে বলেছেন — তখন একটা রাজ্য সংগঠনের নেতৃত্বের পদ ছেড়ে একটি থানা সংগঠনের দায়িত্ব নিতে তিনি সামান্যতম দ্বিধাও অনুভব করেননি।

কমরেড মিলন মজুমদার সুবক্তা ছিলেন না, কিন্তু নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যে, পার্টির সংহতিরক্ষায় তিনি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন। মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এলেও মধ্যবিত্ত সুলভ মানসিকতাকে অনেকটাই বর্জন করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। কমরেড মিলন মজুমদারের মৃত্যুতে দল একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, দলের দায়িত্ব পালনে নিবেদিতপ্রাণ বিপ্লবী সংগঠককে হারাল।

কমরেড মিলন মজুমদার লাল সেলাম

'বিড়ি শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম আইনটুকুও বিড়ি মালিকরা মানছে না'

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত করণদীঘি বিড়ি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল গত ১২ এপ্রিল গোপালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। করণদীঘি থানার বিভিন্ন গ্রাম থেকে ৩ হাজার পুরুষ ও মহিলা বিড়ি শ্রমিক এই সমাবেশে যোগ দেন। প্রকাশ্য সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন-এর রাজ্য সভাপতি তথা বিড়ি শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা কমরেড আব্দুস সঈদ। তিনি বলেন, বিড়ি শ্রমিকদের জন্য দেশে যে ন্যূনতম আইনটুকু আছে তা বিড়ি মালিকদের মানতে বাধ্য করানোর দায়িত্ব সরকারগুলি বারবার অস্বীকার করছে। ২৭ বছরে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার আজও বিড়ি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি চালু করেনি। মালিকরা মজুরি চুক্তি মানছে না, মালিকদের কোনো শাস্তিও হয় না। বিড়ি মালিকরা সরকারের বিভিন্ন কর বাবদ কোটি কোটি টাকা ফাঁকি দিয়ে চলেছে। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর নেতৃত্বে ১৯৯১ সালে ক্ষেত্রবাড়ির মজুরি বৈষম্য দূরীকরণ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার বৈষ্ণবডাঙ্গায় শ্রমিকদের পি-এফের ৩ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা উদ্ধারের দাবিতে আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি সঠিক রাজনৈতিক লাইন ও নেতৃত্বের ভিত্তিতে শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস বলেন, বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প নিয়ে সি আই টি ইউ মিথ্যা প্রচার করছে। এই স্কীমের টাকা রাজ্য সরকারের নয়। বর্তমানে প্রতি হাজার বিড়ি থেকে বিড়ি মালিকদের এই স্কীমে ৪ টাকা করে সেস দিতে হয়। সেই টাকা থেকে নির্ধারিত বিভিন্ন স্কীমে সঠিক আবেদনের ভিত্তিতে বিড়ি শ্রমিকেরা টাকা পেয়ে থাকে। ছাঁট বিড়ি দেখিয়ে, ওজন ঠকিয়ে, দালালি করে শ্রমিককে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এলাকার প্রবীণ সংগঠক ফজলুল হক বলেন — পুরুষ ভাইদের বুঝতে হবে, তাদের স্ত্রীরা যে শ্রম দিচ্ছে, তার ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করা আসলে তাদের অপমানিত করা। এর যোগ্য জবাব পুরুষদের দেওয়া উচিত। তার জন্য যথার্থ আন্দোলনের সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হবে। সভার প্রধান অতিথি এস ইউ সি আই-এর জেলা সম্পাদক কমরেড শ্যামল দে বলেন, সমস্ত রাজনৈতিক দল সংসদীয় রাজনীতির মোহে আন্দোলনের ঝাণ্ডা ফেলে দিয়ে গরিব মানুষের পকেট কেটে মালিক তথা পুঁজিপতিশ্রেণীর সেবা করছে। এভাবেই তাদের আস্থাভাজন হয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রের মসনদে থাকতে চাইছে। তাই যারাই ভারতবর্ষে শ্রমিকশ্রেণীকে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইছে তারাই এস ইউ সি আই দলের প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে গড়ে ওঠা ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পতাকাতলে সামিল হচ্ছে। প্রকাশ্য সভা পরিচালনা করেন কমরেড কমল দে। সভায় মহিলা বিড়ি শ্রমিকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন ২০০ জন বিড়ি শ্রমিক। আন্দোলনের কর্মসূচি সহ সাংগঠনিক অনেকগুলি প্রস্তাব প্রতিনিধি অধিবেশনে গৃহীত হয়। সম্মেলন শেষে কমরেড ফজলুল হককে প্রধান উপদেষ্টা এবং কমরেড কমল দে ও কমরেড মুক্তার আহমেদকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক করে ১৩ জনের কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

বৃত্তি পরীক্ষার ফল ঘোষণা

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফল ১৮ এপ্রিল প্রকাশ হয়েছে। এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় সওয়া তিন লক্ষ। পাশের হার ৬৭.০২ শতাংশ। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ২৬.১১ শতাংশ, দ্বিতীয় বিভাগে ২৮.৮৯ শতাংশ এবং সাধারণভাবে ১২.০২ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে। এবার তুলনামূলকভাবে পাশের হার গতবারের চেয়ে সামান্য বেশী।

বৃত্তি পরীক্ষায় এবছর প্রথম স্থান অধিকার করেছে মেদিনীপুর জেলার নির্মল হৃদয় আশ্রমের ছাত্রী কমলকলি মাইতি। ৪০০ নম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত তার নম্বর ৩৯৩।

মাতৃভাষা-সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস-ভূগোল, বিজ্ঞান ও ইংরেজি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে মাতৃভাষা ও গণিতে পাশের হার প্রায় সমান। (যথাক্রমে ৭৮.২৪ ও ৭৯.৬৮)। সবচেয়ে ভাল পাশের হার বিজ্ঞান বিষয়ে ৮৮.৬৩ শতাংশ। ইংরাজিতে পাশের হার ৮৬.৭১ শতাংশ এবং ইতিহাস-ভূগোলে ৭৭.৭৮ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে।

বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতী-মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রাজ্য পর্যায়ে ৫০ জন ও জেলা পর্যায়ে ৪৭৫ (মোট ৫২৫ জন) জনকে বৃত্তি দেওয়া হবে। অর্থের পরিমাণ ছাত্রপিছু এক বছরের জন্য যথাক্রমে ১২০০ টাকা ও ৬০০ টাকা। আগামী ২৯শে মে ক'লকাতায় কেন্দ্রীয়ভাবে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এদের হাতে বৃত্তির অর্থ ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হবে।

উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয় যে রাজ্য সরকার এবছর হঠাৎ করে চতুর্থ শ্রেণীতে যে বর্হিমূল্যায়ন শুরু করার কথা ঘোষণা করেছে সেটি কোন পরীক্ষাই নয়। উন্নয়ন পর্ষদের বৃত্তি পরীক্ষার বিপুল জনপ্রিয়তা দেখে আতঙ্কিত হয়ে হঠাৎ করে এই তুঘলকি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদি সত্যিই পরীক্ষা চালু করতে সরকার আগ্রহী হয়, তাহলে পাশ-ফেল প্রথা এবং বৃত্তি প্রদান সহ উপযুক্তভাবে এই পরীক্ষা সরকার চালু করুক।

মার্কিনী 'গণতন্ত্র' থেকে হাইতির মানুষ মুক্তি চাইছে

বিশ্বের নব নব প্রান্তে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ বুশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নবদিগন্ত উন্মোচনের নিত্য নতুন প্রয়াস ও তার মহত্ব নিয়ে পশ্চিমী ও বিশেষত মার্কিন প্রচার মাধ্যমের নিরন্তর প্রচারে হয়ত এখনও অনেকেই বিভ্রান্ত। কিন্তু সেই মহিমার স্বরূপের স্বাদ একবার পাবার পর হাইতির মানুষের সে সম্পর্কে আজ আর কোন মোহ অবশিষ্ট নেই। তাঁরা এখন সেই 'বুশীয়' স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারলে বাঁচেন।

বছরখানেক হল, সেখানে মার্কিন মদতে রাষ্ট্রপতি জাঁ বাত্রাঁ অরিস্তিদের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে তাঁকে তাঁর পরিবারসহ গোপনে দেশের বাইরে নির্বাসনে পাঠান হয় ও তাঁর জায়গায় বসানো হয় বুশ নিযুক্ত নতুন 'গণতান্ত্রিক' নেতা জেরাদি লাতোর্তুর সরকারকে।

আর সেই নতুন লাতোর্তু সরকারের সাথে সাথে নতুন করে ফিরে আসে প্রাক্তন পুলিশবাহিনী ও কুখ্যাত ডেথ স্কোয়াডের সদস্যরাও। প্রাক্তন স্বৈরাচারী একনায়ক দ্যুভালিয়ারের আমলে এই বাহিনীরই দৌরাত্ম্যে ও ভয়াবহ অত্যাচারে দেশের সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছিল। সে ভয়ঙ্কর স্মৃতি হাইতির মানুষের মনে এখনও যথেষ্ট টাটকা।

আজ সেখানে উৎখাত হওয়া অরিস্তিদে সরকারের সদস্যদের স্থান হয়েছে অন্ধকার কারাগারে। যে কোন ধরনের বিক্ষোভ সেখানে আজ নিষিদ্ধ। পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে খুন করছে বিক্ষোভকারীদের। পশ্চিম গোলার্ধের এই দরিদ্রতম দেশটিতে আজ জীবনের অবস্থা সত্যিই ভয়াবহ। রাস্তার ধারে ধারে মৃতদেহ স্তূপাকৃতি করে রাখা, নানা কারণে মৃত্যুর হার আজ সেখানে এতটাই উর্ধ্বমুখী যে সন্দেহ হয় জীবনের সেখানে সত্যি কোন দাম আছে কিনা। অথচ ওয়াশিংটনের কথা অনুযায়ী হাইতি এখন গণতন্ত্রের পথে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সেখানে রাজধানী পোর্ত-অ-প্রিন্সে ২০০০ নিরস্ত্র মানুষ জড়ো হয়েছিল নির্বাসিত রাষ্ট্রপতি অরিস্তিদের সমর্থনে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল নির্বাসিত রাষ্ট্রপতিকে ফিরিয়ে আনার দাবিতে একটা মিছিল করা। কিন্তু বিনা প্ররোচনায় পুলিশ সেই নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালায়। এর ফলে অন্তত ২ জন মারা যায় এবং ২০ জন আহত হয়। অথচ ঘটনাস্থলের কাছেই তখন মোতায়েন ছিল ব্রাজিলীয় সেনা অফিসারদের নেতৃত্বে রাষ্ট্রপুঞ্জের শান্তিরক্ষীবাহিনী। কিন্তু নিরস্ত্র মানুষদের উপর এই নির্বিচারে গুলিচালনা রুখতে তারা টুঁ শব্দটিও করেনি। রাষ্ট্রপুঞ্জের বাহিনীর এই ভূমিকায় বিশ্বের নানা প্রান্তে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

হয়তো বা তাদের এই ন্যক্কারজনক ভূমিকায় বিশ্বজুড়ে সমালোচনার ফল হিসাবেই গত ৪ মার্চ দেখা গেল রাজধানী পোর্ত-অ-প্রিন্সের রাস্তায় অরিস্তিদের পক্ষে আরেকটি বিক্ষোভ মিছিলকে ব্রাজিলীয় সেনারা পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে। মিছিলকারীর সংখ্যা এবারও প্রায় ২০০০। কিন্তু এবার আর পুলিশ গুলি চালাতে সাহস পায়নি। বিক্ষোভকারীরা দাবি জানাল, "মার্কিন মদতপুষ্ট অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে।"

গত ৪ মাসে হাইতিতে অরিস্তিদের সমর্থনে বিক্ষোভ বাড়তে থাকার সঙ্গে সঙ্গে অন্তত ৪০০ মানুষ খুন হয়েছেন। এঁদের বেশির ভাগই হলেন অরিস্তিদের সমর্থক। এঁরা সমাজের সেই দরিদ্রতম অংশের মানুষ — যাঁরা কোনভাবেই চান না, দেশ আবার ফিরে যাক সেই যুগে, যখন মার্কিন ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থই ছিল দেশের শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে শেষ কথা।

মার্চ মাসের প্রথম দিকে মার্কিন কংগ্রেসে লস অ্যাঞ্জেলসের কৃষ্ণাঙ্গ জনসমষ্টির প্রতিনিধি, ম্যাক্সিন ওয়াটার এই ব্যাপারে সঠিক তথ্যানুসন্ধানের জন্য হাইতিতে যান। তিনি জেলে গিয়ে অনশনরত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইভ নেপচুনের সঙ্গেও দেখা করেন। পরে সেই কারাগারের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, অবস্থা সত্যিই ভয়ঙ্কর ও নিন্দাজনক।

তিনি আরও বলেন যে, "আমি অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে আবেদন জানাই যে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নেপচুন সহ সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হোক। তাঁদের উপর অন্তর্বর্তী সরকারের এই দমননীতির অবিলম্বে অবসান হওয়া দরকার। সারা পৃথিবীই সেই দিকে তাকিয়ে আছে।"

কারখানা (সংশোধনী) বিল নারীর কাজের অধিকারের স্বার্থে নয়

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা কর্তৃক অনুমোদিত কারখানা (সংশোধনী) বিল সম্পর্কে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী ৩১ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন,

সংবাদে প্রকাশ যে, অফিস কারখানায় রাতের শিফটেও মহিলাদের কাজ করার সুযোগ দিতে কারখানা আইন (সংশোধনী) বিলটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা পুনরায় পেশ করে আইনে পরিণত করার পক্ষে সম্মতি দিয়েছে। মূল আইনে ছিল, সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত নারী শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো যাবে না। সংশোধনীতে বলা হয়েছে, কারখানা কর্তৃপক্ষ যদি নারী শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত নিরাপত্তা এবং পরিবহনের ব্যবস্থা করতে পারে, তাহলে ঐ সময়ের মধ্যেও মহিলাদের দিয়ে কাজ করানো যাবে।

এই বিলের দ্বারা কাজের অধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষ-কর্মীদের সঙ্গে মহিলা-কর্মীদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে — একথা আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এবং সে কারণে বহু মানুষই বিলটিকে সাদরে আহ্বান জানাতে পারেন। কিন্তু এদেশের মহিলাদের নিরাপত্তার বেহাল অবস্থার কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। এদেশে আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি এমন যে, আইনের রক্ষকরাই বহু সময়ে মহিলাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠন করে থাকে। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির ঘটনাও প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে।

সরকারকে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার — যা তাদের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে, তা সুনিশ্চিত করার জন্য সরকারকে এমনকী একটি আলাদা আইনও করতে হয়েছে। এই অবস্থায়, রাতে কাজ করা, বা না করার বিষয়টি মহিলা-কর্মীদের ইচ্ছাধীন না রেখে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হলে, সম্ভ্রমহানির শিকার হওয়া অথবা ছাঁটাই হয়ে যাওয়া — এ'দুটির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে নারী শ্রমিকরা কার্যত বাধ্য হবে।

কমরেড ছায়া মুখার্জী বলেন, এর বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের নারীশ্রমিক বোনদের প্রতি আবেদন করছি, তাঁরা যেন মনে না করেন যে এই আইনের দ্বারা কাজের ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে মহিলাদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তাঁদের বুঝতে হবে, সংশোধনীটি গৃহীত হলে, নারীশ্রমিকরা রাতে কাজ করতে রাজি না হলে কারখানা-মালিকরা তাঁদের ছাঁটাই করে দেওয়ার হাতিয়ার হিসাবেই এই নয়া সংশোধনীকে ব্যবহার করবে।

পোপকে সাম্রাজ্যবাদীরা কীভাবে ব্যবহার করেছে

পাঁচের পাতার পর

শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ঐ সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। যে সমাজে মানুষ অনাহারে থাকে, অবিচার, অত্যাচার ও অন্যায় যুদ্ধে নিপীড়িত হয় — সে সমাজে আমাদের মানসিক ও বৌদ্ধিক প্রয়োজন কখনই পূরণ হতে পারে কি?

সাম্রাজ্যবাদী - পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণী সর্বদাই বস্তুগত সম্পদ করায়ত্ত করার জন্য লালায়িত, এটাই তাদের স্বভাব। তবুও তারা আধ্যাত্মিকতার পূজারী দ্বিতীয় জন পল-এর মধ্যে তাদের বন্ধু খুঁজে পেল, পোপের ভূমিকার মধ্যে সমস্বার্থের সন্ধান পেল। কোনও উন্নাসিক হয়তো বলতে পারেন, ভগবানের দূত পোপ মর্ত্যে এসে 'শয়তান'-এর সঙ্গেই গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন।

(সূত্র ঃ ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পত্রিকা, ১৪-৪-০৫)

বিহার

মুজফ্‌ফরপুরে শিক্ষার দাবিতে ধরনা

জনবিরোধী শিক্ষানীতি এবং পরিকাঠামোগত দুর্বলতার জন্য বিহারে শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি ঘটছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুর্নীতি, পরীক্ষায় গণটোকাটুকি, ঢালাও নম্বর ও ভ্রান্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি — যা শিক্ষাকে দ্রুত ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে সেভ এডুকেশন কমিটির উদ্যোগে গত ২৯ মার্চ মুজফ্‌ফরপুরে জেলাশাসকের দপ্তরে ধরনা অনুষ্ঠিত হয়। বহু বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, অধ্যাপক, ছাত্র এবং সাধারণ মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেন। জনসমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমিটির জেলা সম্পাদক বি প্রশান্ত, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শশীকান্ত ঝা, অধ্যাপক নওলকিশোর প্রসাদ সিংহ, বিপিনবিহারি প্রসাদ, রত্নেশ্বর প্রসাদ ঠাকুর, অধ্যাপক বিজয়কুমার শর্মা এবং বালেশ্বর রসুলপুরি। পরে ৬ দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি জেলা শাসকের কাছে পেশ করা হয়।

২৪ এপ্রিল

এস ইউ সি আই প্রতিষ্ঠা দিবসে

সমাবেশ

শহীদ মিনার ময়দান, বিকাল ৪-৩০টা

বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

সভাপতি ঃ কমরেড ইয়াকুব পৈলান

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in